ভারতের

স্বাধীনতার চাল্লশ

বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে বিশাল

দেশের খ্যাত-অখ্যাত বীর যোদ্ধা-

বীরাঙ্গনা-শহীদদের পবিত্র স্মৃতি-উদ্দেশে

ও

জাতীয় সংহতির অতন্দ্র ভাবনায় অতীত-বর্তমান-

ভবিষ্যতের দেশপ্রিয় নাগরিকদের স্বাদেশিক

চেতনার প্রতি নিবেদিত বাংলা কাব্য-

সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক

শ্রদ্ধার্ঘ্য-সংকলন

শ্রীশান্তি সিংহ—
প্রীতিভাজনেষু,

বিপুল সংখ্যক কবির বিপুলতর সংখ্যক কবিতা একত্র করে আপনি যে সংকলন সম্পাদনা করেছেন তা একখানি কোষগ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। এর মধ্যে পাওয়া যায় হারিয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া সেইসব কবিতা যা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি আমাদের মনে গেঁথে গেছে, কিন্তু কার কোন্ কবিতার অঙ্গ তা আমরা বলতে পারিনে। এই সংকলনে কবিতার উদ্দেশ মেলে। কবির জন্মসাল ও মৃত্যুসালেরও উল্লেখ। সেদিক থেকে এটি একটি রেফারেন্সের বই।

পুরাতনদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অধুনাতনদের কবিতাও আছে। তাঁদেরও জন্মসাল, কারো কারো মৃত্যুসাল। তাঁদের বেশির ভাগ কবিতাই আমার অজানা। আপনাব সৌজন্যে আমি তাঁদের কবিতার স্বাদ পাচ্ছি। কিন্তু উদ্দীপনা বোধ করছিনে। যুগটা বদলে গেছে।

এক কথায় এই সংকলন দুটি বিভিন্ন যুগেব কবি-সম্মেলন। একদল কবি প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের, অপর দল উত্তর-স্বাধীনতা যুগের। কেউ কেউ উভয় যুগের মধ্যে সেতুবন্ধন করছেন। এরূপ একটি সংকলনের প্রয়োজন ছিল। আমরা তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি উভয় যুগের মূল প্রেরণার।

দুঃখের বিষয় উত্তর-স্বাধীনতা যুগের পূর্ব-বঙ্গের স্বতন্ত্র ধারাটি অনুপস্থিত। পূর্ববঙ্গ যেন বাঙালী কবিদের স্বদেশ নয়। একমাত্র প্রতিনিধি 'বাংলাদেশ' নামক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার।

তবে এ কথাও ঠিক যে, পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব-পাকিস্তানের বা 'বাংলাদেশে'র কবিতার মূলপ্রেরণা অনারূপ। এপারের সঙ্গে ওপারের কবিতা মিশ খেত না। সুতরাং বাদ পড়েছে বলে আপসোস অনুচিত। তবু ভিতরে ভিতরে আমি বেদনা বোধ করি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমাদের মিলন হলো না। তার জন্যে চাই এমন একটা সুর যেটা এপার ওপার দুই পারেই সমান। ইতিহাস তার অপেক্ষায় আছে।

আপনার গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। নমস্কারান্তে। ইতি।

আপনার
অন্নদাশঙ্কর রায়

## সম্পাদকের নিবেদন

স্বাদেশিকতা বা দেশাত্মবোধ, যার ইংরেজি নাম Nationalism, তার যথাযথ রূপ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগে তেমন পাওয়া যায় না। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের হাতে বাংলার পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ—দেশবাসীর অন্তরে যথেষ্ট স্বাদেশিক চেতনার অভাব। জাতীয় জাগরণের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ এবং রাজনৈতিক চেতনার উপযুক্ত প্রকাশ, তা এদেশে উনিশ শতকের আগে যথাযথভাবে দেখা যায় না।

উনিশ শতক এদেশে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। ভারতীয় হিন্দু ও ইসলামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বুকে বিশাল তরঙ্গের আঘাত হানল পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি। এই নবজাগরণের তরঙ্গ রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে উদ্বেল করেছিল। বিজ্ঞানমনস্ক-যুক্তিবাদী চেতনায় দেশীয় কুসংস্কার-উচ্ছেদ-অভিযানের সঙ্গে তাঁরা দেশীয় শাস্ত্রের নব মূল্যায়ন, অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার, মানবতাবাদ তথা স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে সচেতন হন। রামমোহনের চিন্তায় জ্ঞান ও কর্মের, cosmic consciousness ও social consciousness-এর সমন্বয় ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে জনৈক গবেষক বলেছেন, "The Western political philosophers who seem to have influenced the mind of Raja were not Rousseau and Tomas Paine, but Montesquieu, Blackstone and Bentham. From Montesquieu's famous treaties on the 'Spirit of the Law' (1748) he derived the ideas of the separation of powers and of the Rule of Law both of which he emphasises again and again in all his writings. Bentham's 'Fragment on Government' (1776) and the 'Introduction to morals ahd Legislation' (1789) had a real hold on the mind of the Raja." জনগণের স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও জাতীয় মেরুদণ্ড গঠনের জন্য তিনি বাংলা ভাষায় 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং ফারসী ভাষায় 'মীরাৎউল-আখবার' নামে পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার Press Ordinance জারি করেন। রামমোহনের নেতৃত্বে দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালি সে আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। প্রসঙ্গত ১৮২৭-এর Jury Act-এর বিরুদ্ধেও রামমোহনের প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য।

স্কটিশ ইংরেজ ডেভিড হেয়ার রাজা রামমোহনের সহায়তায় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এ কলেজের

গুরুত্ব সমধিক। এর আগে রামমোহন রায়ের অ্যাংলো হিন্দু স্কুল (যে-স্কুলের ছাত্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ); ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমি (সেখানের বিখ্যাত ছাত্র হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও), ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী (যার ছাত্র যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত) এ ব্যাপারে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

১৮২৬-এর মার্চ মাসে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর সম্পর্কে টমাস এডওয়ার্ডস বলেছেন, "The teaching of Derozio, the force of his individuality, his winning manner, his wide knowledge of books, his own youth, which placed him in sympathy with pupils, his open, generous, chivalrous nature, his humour and playfulness, his fearless love of truth, his hatred of all that was unmanly and mean, his ardent love of India...his social intercourse with his pupils, his unrestricted efforts for their growth in virtue, knowledge and manliness produced and intellectual and moral revolution in Hindu society since unparalleled." তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-'৫৭), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-'৮৭), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-'৯৮), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪-'৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-'৫৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-'৭০), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-'৯৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-'৮৩) প্রভৃতি ছাত্রদের ডিরোজিও হিউমের রচনা, টম পেইনের 'The Age of Reason' প্রভৃতি পড়ার জন্য উৎসাহ দেন। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মুখপত্র 'পার্থেনন', 'এথেনিয়াম' প্রভৃতিতে হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র আক্রমণ চালান হয়। মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে এক ছাত্র লেখেন, "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism". ফলত, ডিরোজিওর যুক্তিবাদের সঙ্গে নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা এদেশের রক্ষণশীল শিবিরে প্রতিবাদী ঝড় জাগায়। কিন্তু ডিরোজিও শুধু সমাজ ভাঙনের গান শোনাননি; ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁরই উদ্যোগে স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চার জন্য Academic Association-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এ সভায় সাহিত্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন-সমাজতত্ত্ব-স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির চর্চা হত। ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙা স্কুলেও তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছেন। অথচ রাধাকান্ত দেববাহাদুর, দেওয়ান রামকমল সেন প্রমুখ রক্ষণশীল সমাজপতিদের চাপে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে শুধু 'পার্থেনন' পত্রিকা বন্ধ হয়নি, ১৮৩১-এর ২৩শে এপ্রিল ডিরোজিও-কে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না-দিয়ে কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাই ২৫শে এপ্রিল (১৮৩১) তাঁর পদত্যাগ। ফিরিঙ্গী ডিরোজিও-র কবিতায় এদেশে প্রথম ভারতবর্ষ-বিষয়ক স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বল পরিচয় ফুটে

ওঠে। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "The Fakeer of Jungheera A Metrical tale and other poems"-এর ( ১৮২৮ ), প্রারম্ভিক কবিতা—'TO INDIA—MY NATIVE LAND'-এর অনুবাদ সেকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বদেশ আমার' নামে করেছেন; একালের বিশিষ্ট গবেষক ও কাব্যরসিক ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত-ও 'ভারত আমার, স্বদেশ আমার' শিরোনামে তাঁর "ঝড়ের পাখি: কবি ডিরোজিও" গ্রন্থে করেছেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ডিরোজিয়ান কাশীপ্রসাদ ঘোষ-ও কয়েকটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বদেশ প্রেমের ইংরেজি কবিতা লেখেন। তিনি বেঙ্গল অ্যানুয়েল, লিটারারী গেজেট, ক্যালকাটা ম্যাগাজিনে লিখতেন। ফলত, বাংলা সাহিত্যের প্রতকীর্তি কোন কোন সমালোচক ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এদেশে প্রথম স্বদেশপ্রেমের ইঙ্গিতের যে-কথা লিখেছেন, তা যথার্থ নয়। তাছাড়া শুধুমাত্র স্বদেশভূমি মাতৃরূপা-ই নয়, মাতৃভাষার বন্দনায় মধ্যেও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় ফুটে ওঠে। তাই রামনিধি গুপ্তের 'স্বদেশী ভাষা' কবিতাটি প্রবাদপ্রতিমরূপে আজও মুখে মুখে ফেরে। যদিও তাঁর স্বাদেশিক চেতনায় ভারত-আত্মার মর্মধ্বনি শোনা যায়নি, তবু স্বদেশী ভাষার প্রাদেশিক চেতনার মধ্যে স্বদেশপ্রীতির ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

ঈশ্বরগুপ্ত যুগসন্ধির কবি। তাঁকে বাংলা কাব্যের 'জেনাস' বলা হয়। সিপাহী বিদ্রোহ, বিধবাবিবাহ-আন্দোলন তিনি সমর্থন করেননি, পাশ্চাত্য সভ্যতার নতুন তরঙ্গাভিঘাতে হতচকিত হয়ে গেয়ে উঠেছেন, "হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে। যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে।" অথচ স্বদেশপ্রীতি তাঁর কবিতায় আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। 'স্বদেশ', 'ভারতের অবস্থা' প্রভৃতি কবিতায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মধুসূদন দত্ত ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে 'EXTEMPORARY SONG'-এ যদিও লেখেন, "And oh! I sigh for Albion's stand/As if she were my native-land!"—তবুও পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় অনন্ত দেশপ্রীতি ফুটে ওঠে। সিপাহী-বিদ্রোহের চার বছর পর লেখা 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ রাবণ-ইন্দ্রজিৎ চরিত্রেও তার ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রমাণ আছে।

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে চার্টার আইনে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোম্পানীর এক লক্ষ টাকা বরাদ্দের নির্দেশ দেওয়া হয়। এদেশে ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের উদার প্রচেষ্টার পিছনে গোপন রহস্য ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে মেকলের মন্তব্যে ধরা পড়ে—"We must at present do our best to form a class who may be interpreter between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect."

ইংরেজ সরকারের 'চুঁইয়ে-পড়া শিক্ষানীতি'-র (Downward Filtration Theory) ফলে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা ঘটলেও উপরতলার শিক্ষিত সমাজ বার্ক, শেরিডন, ফক্স প্রমুখের লেখা থেকে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা পেয়েছে। যেমন টমসনের 'Rule, Britannia' কবিতার সাগররানী ব্রিটানিয়ার বন্দনা গানে উগ্র দেশপ্রেম তীব্রভাবে ফুটে ওঠে। মেস্‌ফিল্ড, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় শান্তসমাহিত দেশপ্রীতির প্রকাশ। হেনলীর কবিতায় আছে—"what have I done for you,/England, my England ?/what is there I would no do,/England, my own ?" ইংরেজি কবিতা পড়ে এদেশের শিক্ষিত তরুণরা আত্মসচেতন হয়ে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা পেয়েছে, অনুভব করেছে পরাধীনতার জ্বালা; দেশের অতীতগৌরব-সচেতনতার সঙ্গে পরাধীনতার বন্ধনমুক্তির অভীপ্সা তাঁদের লেখায় ও ভাষণে দেশজুড়ে ক্রমশ তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। আচার্য যদুনাথ সরকার যথার্থই বলেছেন, "The Renaissance was at first an intellectual awakening and influenced our literature, education, thought and art, but in the next generation it became a moral force and reformed our society and religion." তাই মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রমুখের কবিতায় পরাধীনতার তীব্র বেদনা আর গভীর দেশপ্রেম ফুটে ওঠে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে কারণে বলেছেন, "স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, জনহিতব্রত।"

একেশ্বরবাদী রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-'৮৪) প্রমুখ ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজে পাওয়া যায়। যদিও কেশবচন্দ্র সেন সর্বধর্মসমন্বয়বাদী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে ভক্তিবাদী, সংকীর্তনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর 'নববিধান' কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' থেকে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা সঙ্গীতে স্বদেশপ্রেমের সুর শোনা যায়—

"তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্যদের প্রিয়ভূমি সাধের ভারতভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে;
একবার দয়া করি তোল কর ধরি
দুর্দশা-আঁধার তার করহ মোচন।"

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে (গুজরাটী) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-'৮৩) প্রতিষ্ঠিত 'আর্যসমাজ' গড়ে ওঠে। তিনি সারা ভারতে এক ধর্ম

ও এক জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'দেহহীন কণ্ঠস্বর', তিনি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে হিন্দু তথা ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির উদার মানবতাবাদী ধারা পাশ্চাত্য জাতির সামনে তুলে ধরেন। তাঁর লেখায় ও ভাষণে ফুটে ওঠে অনন্ত স্বদেশপ্রেম।

তিতুমীরের ( ১৭৭১-১৮৩১ ) ওয়াহাবি অভ্যুত্থান এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। বারাসতের নারকেলবেড়িয়া গ্রামে 'বাঁশের কেল্লা' তৈরি করে তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮৩১-এর ১৪ই নভেম্বর বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি প্রাণ দেন।

রামমোহনের সমকালীন প্রিন্স দ্বারকানাথের কর্মধারায় স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে বিলেতযাত্রার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশের উন্নতি সাধন।" তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভূম্যধিকারী সভা'-র মুখপত্রে আছে—"The Zamindary Association is intended to embrance people of all descriptions, without reference to caste, country or complexion, and rejecting all exclusiveness, is to be based on the most universal and liberal principles, the only qualification to become its member being the possession of interest in the soil of the country."

১৮৫৭-এ সিপাহী বিদ্রোহ—যাকে এদেশের জাতীয় আন্দোলন হিসেবে এখন দেখা হয়, তার আগেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড়ো বিদ্রোহ বা আন্দোলন হয়েছে। রংপুর কৃষক বিদ্রোহ ( ১৭৮৩ ), দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় চুয়াড় বিদ্রোহ ( ১৭৯৮-'৯৯ ), পলিগার বিদ্রোহ ( ১৭৯৯-১৮০১ ), ভেলোর সেনা-বিদ্রোহ ( ১৮০৬ ), ওড়িশায় পাইক অভ্যুত্থান ( ১৮১৭-২৫ ), কিট্টুরের রানী চান্নাম্মা ও সাঙ্গোলির রায়ান্নার সংগ্রাম ( ১৮২৪-'৩০ ), কোল বিদ্রোহ ( ১৮৩১-'৩২ ), সাঁওতাল বিদ্রোহ ( ১৮৫৫-'৫৬ ), পঞ্জাবের ভাই মহারাজ সিংয়ের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়।

১৮৫৭-এ সিপাহী মহাবিদ্রোহ বা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নির্মমভাবে দমন করেন। ইংরেজের নৃশংসতায় ব্যথিত মির্জা গালিব লেখেন, "আমার সামনে আজ খুনের দরিয়া।" বাহাদুর শাহ্ জাফর রেঙ্গুনে বন্দী অবস্থায় আশাদীপ্ত কণ্ঠে লেখেন, "যতদিন আত্মসম্মানের সৌরভ যোদ্ধাদের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততদিন আশা—ভারতের দাপট একদিন-না-একদিন পৌঁছাবে লণ্ডনে।" ১৮৫৭-র ৫ই সেপ্টেম্বর জার্মানির "Ilutrierte Zeitung" পত্রিকায় রেখায়-লেখায় চিত্রিত হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের নৃশংস নারকীয় রূপ। অথচ ইংরেজ নেতা আর্নেস্ট জোন্স তাঁর "Revolt

of Hindustan" কাব্যগ্রন্থে (১৮৫৭) উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় সিপাহী বিদ্রোহ দমনের আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়া এ দেশের শাসনকার্যে রাজ প্রতিনিধি বা ভাইসরয় নিযুক্তির কথা ঘোষণা করেন (১৮৫৮); এবং গভর্নর জেনারেলই ভাইসরয় হবেন তা-ঠিক হয়। লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় হন (১৮৫৮)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ১৮৫৮-তে বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় হয়। ঐ তিনটি নগরীতে স্থাপিত হয় হাইকোর্ট।

১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজদের নীল চাষের অধিকার দেয়। নীলকর সাহেবরা নীল চাষের জন্য তৎকালীন বাংলার চাষীদের ওপর চাপ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন। ফলে এদেশে দেখা দেয় নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-'৬২)। Indigo Commission's Report থেকে জানা যায়—চাষীরা প্রতি বিঘায় ১০ বাণ্ডিলের মতো নীলগাছ চাষ করত, তা থেকে দু'সের নীল রঙ পাওয়া যেত। তার দাম সেকালে ছিল দশ টাকা। অথচ চাষীদের উৎপাদন-মজুরি ছিল নামমাত্র। চুক্তিভঙ্গকারী চাষীরা সপরিবারে ইংরেজ নীলকরদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হত। সেই নির্যাতন বিধিবদ্ধ করার জন্য ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফৌজদারি আদালতে ইংরেজের স্বার্থে কঠোর দণ্ডবিধি চালু হয়। তাই কার্ল মার্কস বলেছেন, "ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য ব্রিটিশ ভারতের কেবলমাত্র আফিং, তুলা, কার্পাস, নীল, শন এবং অন্যান্য কাঁচামাল উৎপাদন করার জন্য ভারতের স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীণ সংস্থাগুলিকে বলপূর্বক কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেছে।" ফলে ১৮৫৯-'৬০ খ্রীস্টাব্দে নীলবিদ্রোহ ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। নদীয়ার বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস এবং উত্তরবঙ্গে রফিক মণ্ডল নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। ১৮৬০-এ দীনবন্ধু মিত্র লেখেন "নীলদর্পণ" নাটক। সমালোচকদের মতে—"নীলদর্পণ' নাটকে জাতীয়তার যে আবেগ, তার পরিচয় হচ্ছে, 'Constructive Nationalism' প্রচার করা।" 'Nationalism', Royal Institute of International Affairs-এ 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে বলা হয়েছে "a land mark in the history of Nationalism." হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নাগরিক নীলকরদের অত্যাচারকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে, প্রত্যক্ষ দুঃখপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা M. L. L. ছদ্মনামে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এও লিখতেন। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র শিশিরকুমার ঘোষ লেখেন—"It was the Indigo disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitation. Indeed it was the first revolution in Bengal after the advent of the English.

লর্ড লিটন Vernacular Press Act চালু ক'রে এ দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার লাল ফিতার ফাঁস পরাতে চান। নির্ভীক জাতীয়তাবাদী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তখন সুকৌশলে রাতারাতি ইংরেজি পত্রিকা হয়ে যায়।

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সদর্থক ভাব আত্মস্থ ক'রে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সদস্য রাজনারায়ণ বসু "জাতীয় গৌরব সম্পাদনী" বা "গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী" সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল—"স্বদেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, এক কথায় আমাদিগের যাহা কিছু নিজস্ব তৎসমুদয় রক্ষণ ও পোষণ।" রাজনারায়ণের মানসলোকে "হিন্দুমেলা"-র ভাবনার ইঙ্গিত ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে "হিন্দুমেলা"-র বিশেষ গুরুত্ব আছে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল (১২৭৩ সালের ৩১শে চৈত্র) "হিন্দুমেলা"-র প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম তিন বছর চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই মেলা হওয়ায় তার নাম "চৈত্রমেলা"-ও ছিল। এর আরেকটি নাম "জাতীয় মেলা"। জাতীয় মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র একযোগে লিখেছেন, "১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য।" দ্বিতীয় বছরের অধিবেশনের (১৮৬৮) সময় গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "...আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "মিলে সবে ভারতসন্তান একতান মনপ্রাণ গাও ভারতের যশোগান" গানটি [রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা] এ অধিবেশনে গাওয়া হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আট লাইনের একটি স্বদেশী গানও গাওয়া হয়। তা নিম্নরূপ:

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন;
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীয় তরে॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে॥

[রাগিণী বাহার—তাল জৎ]

'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩১২ সালের 'সংগীত প্রকাশিকা'-র ঐ গানের যে স্বরলিপি প্রস্তুত হয়, তাতে গানের ধ্রুবপদ হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র যুক্ত

হয়। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে "হিন্দুমেলা"-র চোদ্দটি অধিবেশনের কথা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "হিন্দুমেলায় উপহার" হিসেবে "হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন'পরি, / গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—"ইত্যাকার ২২ স্তবকের এক দীর্ঘ কবিতা এবং "দিল্লীর দরবার" [ "দেখিছ না অয়ি ভারত সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে, / প্রলয় কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে—" ইত্যাকার ] শীর্ষক আরেকটি কবিতা লেখেন ও পাঠ করেন। এ সময়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ দেশপ্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে বলেছেন, "আমাদের প্রথম বয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রণের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গ্যারিবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং পেট্রিয়টিজমের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।"

"হিন্দুমেলা"-য় যে-সব গান গাওয়া হয়েছিল, তার কয়েকটিকে নিয়ে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে "জাতীয় সঙ্গীত" নামে একটি সংকলন করেন।

"জীবন-স্মৃতি"-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে-একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।" 'সঞ্জীবনী সভা' ( হাম্‌চু পামুহাফ ) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জ্যোতিদাদা ( জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ) এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগবেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত, সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"

ব্রাহ্মসমাজের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরানগর থেকে ১৮৭৪-এর মে মাসে ভারতের প্রথম শ্রমিক পত্রিকা "ভারতের শ্রমজীবী" প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর "শ্রমজীবী" কবিতা ছাপা হয়। তার প্রথম স্তবক নিম্নরূপ—

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই !
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারী নর
ঘুমাবার আর বেলা নাই,
উঠ জাগো ডাকিতেছি তাই।

জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে, ১৮৭৪ কিংবা ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম্‌' গানটি রচনা করেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে "আনন্দমঠ" উপন্যাসে তা স্থান

পায়। কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঐ গানটি নিজস্ব সুরে গেয়েছিলেন। তেণ্ডুলকরের গান্ধীজীবনী 'Mahatma'-র ১ম খণ্ডে বলা হয়েছে, "Bankim's "Bande Mataram" and 'Iqbal's "Hindostan Hamara" were the battle hymns which resounded throughout India". ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী বলেন, "When we sing the ode to motherland, 'Bande Mataram', we sing it to the whole of India." "আনন্দমঠ" উপন্যাসে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার যে দেবীমূর্তি কল্পনা করেছেন, সে রকম অনুধ্যান ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "পুষ্পাঞ্জলি" (১৮৭৬) গ্রন্থেও দেখা যায়। ঐ গ্রন্থ প্রসঙ্গে ভূদেব লিখেছেন, "এই পুস্তকের উল্লিখিত বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়, দেবী প্রভৃতি কেহ বা বহু সহস্র-বর্ষ তপস্যা করেন, কেহ বা অলক্ষিতভাবে বিচরণ করেন, কেহ বা অপর সকল দেবদেবী হইতে পৃথকভূত হইয়া স্বমূর্তি প্রকাশিত করেন বটে। কিন্তু মনে কর, বেদব্যাস স্বজাতি-অনুরাগের মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ স্বরূপ বর্ণনা করা গিয়াছে, তাহা হইলে আর ঐ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বোধ হইবে না।" বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", বিশেষত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সম্পর্কে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, "...Supreme service of Bankim to his nation was that he gave the vision of our Mother."

গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) নাটকেও স্বাদেশিকতার সুর শোনা যায়। "মহাপূজা" (১৮৯০) নাট্যরূপকের মাঝে গিরিশচন্দ্র দেশবাসীকে আত্মনির্ভর হয়ে ভারতমাতার দুঃখ দূর করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ঐ রূপক নাটকে দেবী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতির সংলাপে পরাধীন ভারতের দুঃখ হতাশার সুর ফুটে ওঠে। ব্রিটেনিকাকে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী বলেছেন—

কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারত সন্তানগণে,
কোনমতে শিখিল না আপন নির্ভর ;—
শিল্প-কার্যে নিয়োজিত করিল না কর।
এ দুঃখ কহিব কারে, তব শ্বেতপুত্র-দ্বারে,
পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে,—
শ্বেতপুত্র-শিল্পবলে গৃহে দীপ জ্বলে !
লবণের প্রয়োজন, নিত্য জানে জনে জন,
তব পুত্র হতে তাহা ক্রয় করি আনে ;—
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জ্ঞানে।
প্রিয় ভগ্নী সরস্বতী, নানা বিদ্যা দিল সতী,—
করিতেন যদি হায় এই ভ্রান্তি দূর,—
ভারতের সমকক্ষ হ'ত কোন্ পুর ?

সুজলা সুফলা বামা, ফলে ফুলে সাজে শ্যামা,
বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা সকলি বিফল,
শারীরিক শ্রম বিনা শরীর দুর্বল।

( প্রথম দৃশ্য )

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় Indian National Conference-এর আয়োজন করেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং উমেশচন্দ্র ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে বোম্বাই নগরীতে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতির ভাষণে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জানান—ভারতের বিভিন্ন স্থানের দেশসেবকদের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্প্রীতি-স্থাপন, অসাম্প্রদায়িকভাবে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ এবং শিক্ষিত জনগণের সুচিন্তিত ভাবনার আলোকে দেশের সামাজিক সমস্যার সমাধান।

বাংলার জাতীয়তাবাদী ঐক্যকে দমন বা নষ্ট করার জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা নেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর থেকে তাঁর নির্দেশ কার্যকর হবে বলে জানান হয়। সেই ঘোষণার আঘাত বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিরাট ঢেউ জাগায়। দেশের শহর ও গ্রামের অসংখ্য নরনারী তার প্রতিবাদে সোচ্চার হন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। "সন্ধ্যা", "হিতবাদী" এমন কি "স্টেট্‌সম্যান", "দি লণ্ডন টাইম্‌স", "লণ্ডন ডেইলি", "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান" প্রভৃতি পত্রিকায় কার্জন-নীতির সমালোচনা হয়। অনমনীয় ব্রিটিশ সরকারের নীতির প্রতিবাদে দেশে শুরু হয় বয়কট আন্দোলন। ১৯০৫-এর ১৭ই জুলাই খুলনার বাগেরহাট শহরে এক বিরাট জনসভায় বঙ্গভঙ্গ রদ না-হওয়া অবধি বিদেশী জিনিস বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ নেতা বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐ বছর ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে এক প্রতিবাদী সভায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ সেন, চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রমুখ কবিরা তাঁদের আগুন-জ্বালা-গানে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা জ্বালান! বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন কালে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতমালা সারা দেশে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। 'গীতবিতান'-এ স্বদেশ-পর্যায়ে বেশ কিছু গান আছে। ১৩১২ সালের ভাদ্র-আশ্বিনে এ জাতীয় অনেকগুলি গান লেখা হয়েছে।

১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর [ বাংলা ১৩১২-র ৩০শে আশ্বিন ] কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর হয়। ঐদিন বিস্তীর্ণ বাংলার বাঙালীরা উপবাস দিয়ে জাতীয় শোক পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐদিন "রাখীবন্ধন" উৎসবের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত বাংলার মানুষের মধ্যে ঐক্যের সুর শোনান—"বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটি গেয়ে। বিকেলে কলকাতার ফেডারেশন হলে বঙ্গভঙ্গবিরোধী ঘোষণা পাঠ হয়—"আমরা

স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোনও বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত থাকিব। আমরা এইরূপ কার্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্পে সহায় হউন।" 'রবীন্দ্র জীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "বাঙালির কাছে সেদিন দেশ সত্যই মাতৃরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ...সেই মহাযজ্ঞে শক্তি-মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেশমাতৃকার বন্দনা করিয়াছিলেন।"

বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ দেশনেতা ইংরেজের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নরমপন্থী মনোভাব ত্যাগ করে চরমপন্থী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সেই সংক্ষুব্ধ জাতীয় জীবনে নরমপন্থী, মধ্যপন্থী বা চরমপন্থী সব দলের কর্মী স্বামী বিবেকানন্দের জ্বালাময়ী বাণী থেকে প্রেরণা পেতেন। অ্যানী বেশান্ত তাই বলেছেন, "[ Vivekananda ] rouses the strongest feeling of Nationality."

মারাঠী পেশওয়া বংশের তিলকজী দেশবাসীকে ঐতিহ্যসচেতন ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য 'কেশরী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক বীর শিবাজীর আদর্শ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত হয় শিবাজী-উৎসব। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় শিবাজী-উৎসব পালিত হয়। সে উপলক্ষে বাংলার কবিরা জাতীয়তাবাদী কবিতা লেখেন। এ প্রসঙ্গে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ( ১৩১১ বঙ্গাব্দ ) রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি স্মরণীয়। কবিতাটির শেষ স্তবকে আছে—

মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো,
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

সারা ভারতের বিপ্লবীদের অন্তরে স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদৃপ্ত জলন্ত দেশপ্রেম প্রভাব বিস্তার করেছিল। মাদ্রাজের বিশিষ্ট বিপ্লবীগোষ্ঠীর 'বালভারত' এবং 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা ( যার সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য ভারতী, পরিচালক তিরুমলাচার্য ) স্বামীজীর কথা বারবার উল্লেখ করেছে। সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের

কী গভীর প্রভাব ছিল, তার উল্লেখ টেগার্ট-রিপোর্টে ধরা পড়ে—"There have been several indications that the (Ramakrishna) Mission and its followers are connected with the revolutionary side of the recent political upheaval in India, which has convulsed the student community in Bengal and has more recently still extended its pernicious influence to even more dangerous ground in the Native states of India." তাই তিলকজীর 'মরাঠা' পত্রিকায় শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা হয়েছে—"Swami Vivekananda is the real father of Indian nationalism. He wanted to develop a modern India. Every Indian is proud of this father of modern India."

প্রকৃতপক্ষে উত্তাল স্বদেশীযুগে স্বদেশ আত্মার জলন্তরূপ এবং চির তারুণ্যের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর লেখায় ও ভাষণে ফুটে ওঠে পরাধীন ভারতবর্ষের তীব্র মর্মবেদনা, গভীর স্বাধীনতাস্পৃহা, পরানুকরণপ্রিয়তা-অস্পৃশ্যতা-হীনমন্যতার প্রতি সিংহনাদ, ধর্মের নামে পুরোহিততন্ত্রের শোষণের প্রতি ধিক্কার এবং যারা 'ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী', তাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা। ভারতের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে স্বামীজী স্বদেশীযুগের ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।" ভগিনী নিবেদিতা যথার্থ ই বলেছেন, "ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হত তাঁর বুকের মধ্যে, প্রধ্বনিত হত তাঁর ধমনীতে; ভারতবর্ষ ছিল তাঁর দিবাস্বপ্ন, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর নিশীথের দুঃস্বপ্ন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ—রক্তে মাংসে-গড়া ভারত প্রতিমা। ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তার পবিত্রতা, তার প্রজ্ঞা, তার স্বপ্ন এবং তার ভবিষ্যৎ—সব কিছুর তিনি ছিলেন প্রতীক পুরুষ।" সে কারণে রোঁমা রঁলা বলেছেন, "ভারতের জাতীয় আন্দোলন দীর্ঘকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন ছিল। বিবেকানন্দের নিশ্বাস প্রবাহে সেই বহ্নি শিখা বিস্তার করে এবং তাঁর তিরোধানের তিন বছরের মধ্যেই ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তা দুর্বার হয়ে ওঠে।"

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের একটি ধারা ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে দোল পূর্ণিমার দিন (২৪শে মার্চ) "অনুশীলন সমিতি"-র প্রতিষ্ঠা করে। অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রস্থল ছিল হেদুয়ার মদন মিত্র লেনে, পরে ৪৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (অধুনা বিধান সরণি)। প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু (১৮৭৬-১৯৪৮) স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ পরিচিত ও প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। গুপ্ত সমিতির শীলমোহরে স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা ছিল।

তার গায়ে দেবনাগরী লিপিতে উৎকীর্ণ ছিল 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'; এবং ইংরেজি লেখা 'UNITED INDIA'। বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রবর্তক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০)। স্বামী নিরালম্ব নামধারী এই ব্যক্তিত্ব অগ্নিযুগের ব্রহ্মা প্রপিতামহ হিসেবে আদৃত ছিলেন। জীবনতারা হালদার "অনুশীলন সমিতির ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন, "জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অনুশীলন সমিতির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে—তাহাই হইল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের শেষ উপদেশ, 'সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না', সমিতির মূল প্রেরণা জোগাইয়াছিল। যতদূর জানা যায় নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই সঙ্ঘের নামকরণ করেন 'ভারত অনুশীলন সমিতি'। পরে পি. মিত্র মহাশয় উহা সংক্ষেপে 'অনুশীলন সমিতি' করেন।"

'অনুশীলন সমিতি' থেকে 'যুগান্তর' দলের সৃষ্টি। 'যুগান্তর' কাগজ থেকে (পত্রিকার জন্ম মার্চ, ১৯০৬) ঐ দলের নামকরণ। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজদ্রোহী সম্পাদকীয়ের জন্য এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির প্রত্যক্ষ যোগ গড়ে ওঠে। তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ ধর্মের নামান্তর এবং স্বদেশ ছিল মাতৃস্বরূপা। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১২ই পৌষ 'ধর্ম' পত্রিকায় তিনি আন্তরিক বিশ্বাসে লেখেন, "সেই মহাসৃষ্টিকারিণী' মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্যদায়িনী মহালক্ষ্মী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই দেশের সংযোজনে একীভূত চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবেন।" 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁর সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠে। ফলত, নরমপন্থী কংগ্রেসীদের তিনি 'অ-জাতীয়তাবাদী' (Un-national) বলতেন। 'যুগান্তর' এবং 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দের গভীর স্বদেশপ্রীতির প্রভাব অন্তর্লীনভাবে ধরা পড়ে। তাই 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার ধুরন্ধর সম্পাদকীয়তে (১লা এপ্রিল, ১৯১৩) লেখা হয়—"He (Vivekananda) was using phrases and expressions which were later repeated in the Jugantar with most mischievous results."

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে মোরাদাবাদের বিপ্লবী সুফী অম্বাপ্রসাদ আঞ্জুমান-এ-মুহিব্বান-এ-ওয়াতন (বা 'ভারতমাতা সোসাইটি') প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরপ্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার শান্তিনারায়ণ ১৯০৭-এর ৯ই নভেম্বর এলাহাবাদ থেকে 'স্বরাজ্য' নামে উর্দু সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির আয়ু ছিল মাত্র আড়াই বছর; তার মধ্যে আটজন সম্পাদক দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মহারাষ্ট্রের বীর বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবং তাঁর দাদা গণেশ দামোদর সাভারকর ১৮৯৯-এ 'মিত্রমেলা' এবং

১৯০৭-এ 'অভিনব ভারত সমিতি' নামে বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মাদাম কামা এবং সর্দার সিং রাওজী রাণা ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে স্টুটগার্টের সম্মেলনে ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে যোগ দেন। বিদেশ থেকে ভারতে অস্ত্র পাঠানো এবং বিপ্লবীদের অস্ত্র শিক্ষার আয়োজনে তাঁরা তৎপর ছিলেন।

১৯০৮-এর ১১ই আগস্ট বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মজঃফরপুর জেলে ফাঁসির ঘটনা দেশে প্রতিবাদী চেতনায় দারুণ জোয়ার আনে। মিথ্যা মামলায় ১৭৭৫-এর ৫ই আগস্ট মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি এবং ১৮৯১-এর ১৩ই আগস্ট স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টার অপরাধে মণিপুররাজ টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসি ও দেশে চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল।

বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অনুগামী এবং ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের ছাত্র মদনলাল ঢিংড়া ১৯০৯-এর ১লা জুলাই বিলেতের জাহাঙ্গীর হলে জন কার্জন-ওয়াইলিকে গুলি করে হত্যা করেন। ফলে ঐ বছর ১৭ই আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসির আগে তিনি নির্ভীক বিবৃতি জানান—"বিদেশী সঙ্গীনের সাহায্যে যে জাতিকে দাবিয়ে রাখা হয়, তার তো নিরন্তর সংগ্রাম চালু থাকে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে। ভারতে এখন একমাত্র যে শিক্ষার প্রয়োজন তা হল চরম আত্মদানের শিক্ষা—যে শিক্ষা অন্যকে দেওয়া যায় নিজে প্রাণদান করে, সুতরাং আমি আত্মদান করছি এবং গৌরববোধ করছি এই শহীদত্ব বরণে।"

জাতীয় আন্দোলনের তীব্র চাপে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ কার্জন-প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গ বাতিল করেন, কিন্তু তখন ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরে যায়।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এস্টোরিয়া শহরে মূলত প্রবাসী পাঞ্জাবীরা "গদর" ( বিদ্রোহ ) নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। সম্পাদক ছিলেন লালা হরদয়াল ( ১৮৮৪-১৯৬৯ )। প্রসঙ্গত "গদর-দি-গুঞ্জ" নামক দেশপ্রেমমূলক কবিতার সংকলন উল্লেখযোগ্য।

মানবেন্দ্রনাথ রায়—যাঁর আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে জার্মান অস্ত্র এবং অন্যান্য বিদেশী সাহায্যের আশায় বিদেশ যান। জাপান হয়ে আমেরিকায় গিয়ে 'মিত্রশক্তি'-র পক্ষে যুক্ত হওয়ায় ১৯১৭-এ তিনি 'গদর'-বিপ্লবীদের মতো গ্রেপ্তার হন। মেক্সিকোতে তিনি সোস্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২০-তে তিনি মস্কোয় লেনিনের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

বাংলার রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন ( যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ), মহারাষ্ট্রের বাসুদেব ফাদকের বৈপ্লবিক কর্মধারা স্বদেশে এনেছিল নতুন জোয়ার। তাঁদের বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল আছে। 'ভারতবিধাতা' কবিতা লেখার পাঁচ বছর পরে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লেখেন, "আমাদের বন্দে মাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্ছে

বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত সচিব মণ্টাগু জানান—ভারতীয়দের ধীরে ধীরে স্বায়ত্ত শাসনের সুযোগ দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য। ফলে গান্ধীজী ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতা কিছুটা আশাবাদী ও নরম হন। কিন্তু মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আশা পূর্ণ করে নি। তদুপরি ১৯১৯-এর রাওলাট অ্যাক্ট-এর দমন নীতি এ দেশের মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভ জাগায়। গান্ধীজী শান্ত, নিরস্ত্রভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ পালনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান। ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের এক প্রতিবাদ সভায় জেনারেল ডায়ার বিশাল ভারতীয় জনতার ওপর গুলি চালান। অসংখ্য নিরস্ত্র নরনারী হতাহত হয়। সেই জঘন্য হত্যা-কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ ক'রে, সরকারের কাছে লেখেন ঐতিহাসিক চিঠি। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তরঙ্গ আরও ব্যাপক গভীর হয়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন কর্মসূচী নেয়।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থানের অধিকারী হয়েও ইংরেজ অধীনে সরকারী উচ্চপদ গ্রহণ না-করে, ১৯২১-এর ২১শে জুলাই বিলেত থেকে বোম্বাই বন্দরে নেমে, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজীর পরামর্শে তিনি কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগ্য সহকর্মী হন। ঐ বছর ১৭ই নভেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজের এ দেশে আগমন উপলক্ষে গান্ধীজী ভারতের সর্বত্র হরতাল ঘোষণা করেন। যুবরাজের অভ্যর্থনা বয়কট করায় ঐ বছর ১০ই ডিসেম্বর দমনমূলক আইনে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় বোম্বাই থেকে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক "দি সোসালিস্ট" (১৯২২), লাহোর থেকে গুলাম হুসেন সম্পাদিত উর্দু পত্রিকা "ইনকিলাব" (১৯২২), কলকাতা থেকে নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহমদ সম্পাদিত "লাঙল" (১৯২৫) স্বাদেশিকতা জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৯২৫-এর ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যুতে দেশবাসী গভীর শোকাহত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়, "দেশবন্ধুর চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার জ্বলন্ত দেশপ্রেম—এমন তীব্র স্বদেশপ্রেম এক স্বামী বিবেকানন্দ বা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে আমরা দেখি নাই।" (১৮।৬।১৯২৫)। ১৯৩৭-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে 'যুগান্তর' পত্রিকাও জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনে ভূমিকা নিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে আনন্দবাজার-দেশ-যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকা বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছে।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ। সারা দেশ জুড়ে 'সাইমন গো ব্যাক' মিছিল। ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল। সূর্য সেনের পরিকল্পনায় অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রমুখ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন এবং দেশে অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করেন। কিন্তু শেষ অবধি ইংরেজের হাতে সূর্য সেনের ফাঁসি এবং লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ প্রমুখের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়।

ভারতের স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক, দুনিয়ার মজুর এক হও ইত্যাদি স্লোগানের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লেবার ইউনিয়ন, ক্যালকাটা ট্রামওয়ে মেন্স ইউনিয়ন, বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোশিয়েশন প্রভৃতি সংস্থার বহু হাজার শ্রমিক ১৯২৮-এর ৩০শে ডিসেম্বর কলকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেসের অধিবেশনে হাজির হয়। জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ঐ সভায় বক্তৃতা দেন বঙ্কিম মুখার্জী, কিরণ মিত্র, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতা। সভায় সর্ববাদী সম্মত প্রস্তাব নেওয়া হয়—"শ্রমিক ও কৃষকদের এই জনসভা ঘোষণা করছে যে আমরা দেশের শ্রমিক ও কৃষকগণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত এবং ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সবরকম শোষণ বন্ধ না-হওয়া অবধি নিরস্ত হব না। জাতীয় কংগ্রেসকেও আমরা আহ্বান জানাই ঐ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই যেন তাঁরা সমস্ত জাতীয় শক্তিগুলিকে সংগঠিত করেন।"

ইংরেজ সরকার ১৯২৯-এর ২০শে মার্চ সারা ভারতে ব্যাপক তল্লাসী চালিয়ে ৩১জন কমিউনিস্ট এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকে গ্রেপ্তার করে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সমর্থনে দেশবিদেশে আন্দোলন হয়।

১৯৩০-এর ৮ই ডিসেম্বর। বিনয় বসুর নেতৃত্বে দীনেশ গুপ্ত এবং বাদল ( সুধীর ) গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিং-এ হানা দেন। কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে গুলিবিদ্ধ করা হয়। ইতিহাসের পাতায় অলিন্দ যুদ্ধ বিখ্যাত। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত স্বদেশীদের হাতে কুখ্যাত পেডি, ডগলাস, স্টিফেন্স প্রমুখ ইংরেজ গুলিতে প্রাণ হারান।

কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালন করেন। মহাত্মা গান্ধী রচিত শপথ বাক্য ছিল—"আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবাসী তথা যে-কোন জাতির স্বাধীনতা হইল সহজাত অধিকার। ভারতবাসীর নিজ শ্রমের ফলভোগ করিবার, জীবন ধারণের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সুযোগ ভোগ করিবার এবং উন্নততর জীবন যাপন করিবার অধিকার আছে! কোন সরকার এই সকল অধিকার হরণ করিলে অথবা তাহাদের উপর অত্যাচার করিলে ভারতবাসীর সেই সরকারকে পরিবর্তন করিবার বা ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার আছে। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে শোষণ করিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেহেতু আমরা

বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ঐ দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়। তার আগে অবধি পূর্ব প্রথামত ঐ দিনটি স্বাধীনতা-দিবস হিসেবে পালিত হত।

১৯৩০-এর ১২ই মার্চ গান্ধীজী ৭৯জন সত্যাগ্রহী নিয়ে সবরমতী থেকে ডাণ্ডি ৩৮০ কিলোমিটার পথ অভিযান করেন। ৫ই এপ্রিল সেখানে পৌছে পরদিন লবণ আইন ভঙ্গ করেন। বাংলার মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনায় তার ঢেউ লাগে। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ২৫০০ জন সত্যাগ্রহীর ধরসানা লবণ-আন্দোলন চলে। সারা ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রায় ৯০ হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন। আফগান নেতা আবদুল গফ্ফর খানও গান্ধীজীর অহিংসা নীতির ওপর আস্থাশীল হয়ে "সীমান্ত গান্ধী" হয়ে ওঠেন।

১৯৩০-এ গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তাতে যোগ দেন। ইতিমধ্যে "গান্ধী-আরউইন চুক্তি" হয়। ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। এই অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। গান্ধীজী ভারতের কেন্দ্রে ও প্রদেশে দায়িত্বশীল ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি করেন; কিন্তু তাঁর আলোচনা সার্থক হয়নি। তাই ১৯৩২-এর গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি যোগ দেননি।

১৯৩৩-এর ১লা আগস্ট থেকে গান্ধীজী ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। সেজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন চালাতে সরকারী তরফ থেকে বাধা পান, ফলে অনশন শুরু করেন। স্বাস্থ্য-অবনতির কারণে তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

সাইমন কমিশনের সুপারিশ ও গোলটেবিল বৈঠক আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ভারত-শাসন আইন তৈরি হয়।

১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মোট এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। সিন্ধু ও আসামে কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা বেশি হলেও বাংলা ও পঞ্জাবে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা বেশি ছিল। সে সময় গান্ধীজী রাজাজী প্রমুখ নেতা সমর্থিত পট্টভি সীতারামিয়াকে বিপুল ভোটে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হন। অথচ ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণ পন্থীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ায় তিনি কংগ্রেস ছেড়ে ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরি করেন (১৯৩৯)।

ঐ বছর ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না-করে ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী-ইটালির বিরুদ্ধে যুক্ত করেন। এ সময় মহম্মদ আলি জিন্নাহ্

সাম্প্রদায়িক ভাবনার নানা কথা তোলেন; কিন্তু কংগ্রেসী নেতা আবুল কালাম আজাদ অসাম্প্রদায়িক চিত্তে মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহরু প্রমুখ বিশিষ্ট দেশনেতার সঙ্গে উদারচিত্তে কাজ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটি সম্পর্কে মুসলীম লীগ কিছু আপত্তি জানায়। তখন ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুলাই "হরিজন" পত্রিকায় গান্ধীজী বলেন, "...As a lad, when I knew nothing of 'Ananda Math' or of Bankim, its immortal author, 'Bande Mataram' had gripped me, and when I first heard it sung, it had enthralled me. It never occurred to me that it was a Hindu song or it was meant only for Hindus......It is enthroned in the hearts of millions. The flag and the song will live, as long as the nation lives." ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে জিন্নাহ্ সাহেব দ্বি জাতিতত্ত্ব (Two-Nation theory) অনুযায়ী পাকিস্তানের দাবি রাখেন। লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির প্রস্তাব নিলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করে, কিন্তু ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে জার্মানী-ইটালির পক্ষে জাপানের যোগদান এবং সিঙ্গাপুর মালয় দখল করে ব্রহ্মদেশের সীমানায় তার অগ্রসর ঘটনায় ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়। তখন গভর্নর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগো ভারতবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১৯৪২-এর মার্চ মাসে জাপান রেঙ্গুন দখল করলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষের কথা ভাবে। সে সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরামর্শে ভারতে ক্রীপ্স মিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মতে ক্রীপ্স প্রস্তাব 'a post-dated cheque on a crashing bank'; তাই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ১৯৪২-এর আগস্টে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী নেতাদের কারারুদ্ধ এবং কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করেন। তখন মহাত্মাজীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-র ডাকে দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠন করেন। ১৯৪৩-এর ২৩শে অক্টোবর ব্রিটেন-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে সুভাষচন্দ্র 'দিল্লী চলো'-র ধ্বনি জানান। কিন্তু কিছুটা আশার মুখ দেখেও জাপানের পরাজয়ের ফলে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ করতে হয়। তারপর তাইহাকুর এক বিমান দুর্ঘটনায় ( ২৩শে আগস্ট, ১৯৪৫ ) নেতাজীর মৃত্যু ঘটেছে—এ রকম খবর প্রচার করা হয়। খবরটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন—সেকথা পরবর্তীকালের বহু সুচিন্তিত লেখায় ধরা পড়ে। কিন্তু নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজীর অবদানের নবমূল্যায়ন-ও বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

১৯৪১-এর মে মাসে মালাবারের কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। তার নেতৃত্ব দেন কমিউনিস্ট নেতা কে. পি. আর গোপালন। কয়েকজন কৃষক মারা গেলেও পরবর্তী মামলায় গোপালনের ফাঁসির আদেশ হয়। গান্ধীজী, জওহরলাল প্রমুখ নেতাদের প্রবল আন্দোলনে গোপালনের মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। ইংরেজ সরকারের মতো এদেশের অনেকে ছিলেন কমিউনিস্ট বিরোধী। ফলে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মার্চ ঢাকার তরুণ কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং লেখক সোমেন চন্দের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয়। তার প্রতিবাদে ঐ বছর ২৮শে মার্চ কলকাতায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সমিতির সম্মেলন হয়। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ব্যাপক মন্বন্তরে ৩৫ লক্ষেরও বেশী মানুষ মারা যায়। কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সেই দুর্দিনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৪৪-এর শারদীয় সংখ্যা 'যুগান্তর'-এ কাজী নজরুল ইসলামের 'স্বদেশ' কবিতায় ভারতমাতার বন্দনা গান আবেগদৃপ্তভাবে ফুটে ওঠে—

"জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী, স্বদেশ আমার, ভারতমাতা।"

১৯৪৬-এর ২৯শে জুলাই ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় হরতাল ধর্মঘট হয়। প্রায় ষোল লক্ষ কারখানার শ্রমিক এবং দেশবাসীরা তার সামিল হন। এই বিরাট ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন কমিউনিস্টরা। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট 'Great Calcutta Killing' নামে যে দুঃখজনক হিন্দু-মুসলমানদের বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তার বিরুদ্ধে প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ বিশেষ মানবিক ভূমিকা নেয়। এসময় তেভাগা কৃষক আন্দোলনও দেশে ঝড় তোলে।

গভর্নর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষে নতুন সংবিধান রচনার আগে একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু জিন্নাহ্‌র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের বদ্ধপরিকর ধারণায় সিমলায় সর্বদলীয় আলোচনা ব্যর্থ হয়। নানা টানা-পোড়েনের ভেতর ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে জওহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লীমেন্ট এট্‌লী জানান—১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে ভারতীয় নেতাদের হাতে এদেশের শাসনভার অর্পণ করা হবে। পক্ষপাতদুষ্ট ওয়াভেলের জায়গায় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দায়িত্বে এসে (জুন, ১৯৪৭) ঘোষণা করেন- মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলির ইচ্ছানুযায়ী পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা যাবে। ফলত, বাংলাদেশ এবং পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান অঞ্চল বিভক্ত হবে। তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা আইন ( The Indian Independence Act, 1947 ) পাস করে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক

ডোমিনিয়ন গঠন করে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়—ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন দেশ গড়ে ওঠে।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ভারতে নতুন সংবিধান চালু হয়। সেই সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৬-এর ভারতীয় সংবিধান (৪২তম সংশোধন) অনুযায়ী ভারত সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Socialist Secular Democratic Republic) রাষ্ট্র।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" গানটি ('ভারতবিধাতা' কবিতা) গাওয়া হয়। তার আগে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম" গানটি গীত হয়। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের গণপরিষদ ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি "জনগণমন অধিনায়ক" গানটিকে ('ভারতবিধাতা' কবিতার প্রথম স্তবক মাত্র) জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) হিসেবে গ্রহণ করেন। তার আগে অবধি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটি জাতীয় সঙ্গীত ছিল। ঐ দিন (১৯৫০-এর ২৪শে জানুয়ারি) রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে গণপরিষদের অধিবেশনে বলা হয়—"...The composition consisting of the words and music known as Jana Gana Mana is the National Anthem of India, subject to such alterations in the words as the Government may authorise as occasion arises; and the song Vande Mataram which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it (Applause). I hope this will satisfy the members."

ভারতের জাতীয় পতাকা তেরঙা। পতাকার ওপরের রঙ গেরুয়া, মাঝে সাদা, নিচের অংশ সবুজ। মাঝের সাদা জায়গায় ঘন নীল রঙের অশোক চক্র। তাতে আছে চব্বিশটি দণ্ড (Spoke)। পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ৩ : ২, অর্থাৎ লম্বায় তিন মিটার হলে, চওড়া হবে ২ মিটার। কিন্তু তিনটি রঙের অনুপাত সমান।

ভারতের জাতীয় পতাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ রকম: ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট কলকাতার পার্সীবাগান পার্কে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়। সেই পতাকায় লাল, হলুদ ও সবুজ রঙ ছিল। রঙের ভাগ ছিল সমান। লাল রঙের জায়গায় আটটি সাদা পদ্ম, হলুদ রঙের অংশে দেবনাগরী অক্ষরে নীল রঙে লেখা ছিল—'বন্দে মাতরম্'। সবুজ রঙের বাঁ কোণে ছিল সাদা রঙের সূর্য ও ডান কোণে সাদা রঙের অর্ধচন্দ্র ও তারা।

জাতীয় পতাকার রঙ ও প্রতীক নিয়ে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। ১৯২১-এর বিজয়ওয়াড়ার সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর হাতে দু' রঙা একটি পতাকা উপহার দেয় এক অন্ধ্র যুবক। সে পতাকার লাল ও সবুজ রঙের অনুপাত সমান ছিল। সে রঙ ছিল হিন্দু-মুসলমানের প্রতীক। গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবে পতাকায় সাদা রঙ আনা হয়। জাতীয় প্রগতির প্রতীক হিসেবে পতাকার মাঝে চিহ্নিত হয় চরকা। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ অবধি বিভিন্ন কংগ্রেস-সম্মেলনে এ পতাকা তোলা হত।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় পতাকায় গেরুয়া, সাদা ও সবুজ রঙ আনা হয়। মাঝে চরকার ছবি। স্বাধীনতার আগে অবধি তা ছিল জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুলাই সে পতাকা গণ পরিষদে সম্মান লাভ করে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পুণ্য লগ্নে দিল্লীর লালকেল্লায় যে জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়, সেখানে সামান্য পরিবর্তন আনেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি জাতীয় পতাকার মাঝে চরকার জায়গায় আনেন অশোকের ধর্মচক্র—যা প্রগতি ও সত্যনিষ্ঠার প্রতীক।

ভারতের জাতীয় প্রতীক (National Emblem) অশোক স্তম্ভের চূড়া। অশোক স্তম্ভের মাথায় পিঠে-পিঠ-ঠেকানো, হাঁ-করা চারটি সিংহের মূর্তি আছে। তিনটি সিংহ দেখা যায়; চতুর্থ টি পিছনে থাকায় দেখা যায় না। সেই মূর্তির পায়ের নিচে আছে একটি করে চক্র। তাদের বলা হয় ধর্মচক্র। সেই ধর্মচক্র জাতীয় পতাকার মাঝে মর্যাদা লাভ করেছে। একেবারে নিচে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে—'সত্যমেব জয়তে'। যার বাংলা অর্থ—একমাত্র সত্যের জয় হয়। এই শ্লোকাংশের পূর্ণরূপ হলো—

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

[ মুণ্ডকোপনিষদ, ৩।১।৬ ]

[ বাংলা অর্থ: একমাত্র সত্যের জয় হয়। চরম অনুভূতির পথে যেতে হলে সত্যকে ধরে রাখা চাই। ]

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ভারত সরকার অশোক স্তম্ভের চূড়াকে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের প্রতীক মর্যাদা দান করেন। সেই জাতীয় প্রতীক (National Emblem) কোন ব্যক্তিগত অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যায় না।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট বৃহস্পতিবার রাত একটায় (ইংরেজি মতে ১৫ই আগস্ট শুরু) দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। সারা দেশ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও মহাত্মা গান্ধী কলকাতার বেলেঘাটার একটি ছোট বাড়িতে ছিলেন বিষাদগম্ভীর। দেশভাগ ও দাঙ্গাবিধ্বস্ত হিন্দু-মুসলমানের অগণিত প্রাণঘাতী স্মৃতিতে তিনি সারাদিন উপবাসী থেকে নীরব নিভৃতে ঈশ্বর অনুধ্যানে মগ্ন থাকেন। অথচ সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে তখন 'জয় হিন্দ', 'বন্দে মাতরম্', 'স্বাধীন ভারত কি জয়' ধ্বনি! সম্প্রতি সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খানের ছেলে ওয়ালি খানের এক বিবৃতিতে জানা গেছে—পাকিস্তানী মনোভাব শুধু দেশভাগ ঘটায় নি, তার মধ্য দিয়ে মুসলমানদেরও খণ্ডিত করা হয়েছে। গবেষণাপ্রসূত তাঁর "ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস: আনটোল্ড স্টোরি অব পার্টিশান" গ্রন্থে তিনি বলেছেন, দেশভাগ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ব্রিটিশের সুপরিকল্পিত চক্রান্তে। সেই চক্রান্তের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার অগ্রগতিরোধে এশিয়ায় এবং তার দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর কতকগুলি মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্রবলয় তৈরি করা। তাই ভারতবর্ষের শরীর থেকে অঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে পাকিস্তানের সৃষ্টি ছাড়া অন্য পথ ছিল না। পরবর্তীকালে তাই দেখা যায়, ব্রিটিশের সেই নীতির অনুসারী হয়ে আমেরিকা পাকিস্তানের সহায় হয়েছে।

পরাধীন ভারতের দুঃখ, জ্বালা, ক্ষোভ, প্রতিবাদী চেতনা অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহাকে যেমন তৎকালীন বাংলা ভাষাভাষী কবিরা তাঁদের কবিতায়-গানে রূপায়িত করেছেন, তেমন দেশভাগের মর্মান্তিক বেদনা বাংলা কবিতায় শুধু নয়, সাহিত্যেরও বিরাট অংশ জুড়ে অশ্রুভরা স্মৃতিসজল!

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনা। বর্তমানে আমরা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পা দিয়েছি। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও এদেশে সাক্ষরতার হার প্রায় চল্লিশ শতাংশ। স্বাধীনতার আগে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় তিরিশ লক্ষ, বর্তমানে দেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় দু'কোটি চল্লিশ লক্ষ। দেশ ভাগের পর থেকে ১৯৬৬ অবধি তথাকথিত পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী হিন্দু এদেশে এসেছেন, অথচ পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র দু'লক্ষ মুসলমান ওপারে গেছেন।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য ও পাটশিল্পে দারুণ সংকট দেখা দেয়। তার কারণ, শতকরা আশিভাগ কাঁচা পাট আসত পূর্ববঙ্গ থেকে, অথচ প্রায় সব চটকলগুলি এপার বাংলায়। স্বাধীনতা-উত্তর কালে চটশিল্পে নিযুক্ত প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার শ্রমিক যাতে বেকার না হয়ে পড়ে, তদুপরি পাটজাত শিল্প বিদেশে রপ্তানি করে প্রায় দেড়শ' কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রায় আয় যেন বন্ধ না হয়, তার জন্য এ বাংলার প্রায় দশ লক্ষ একর ধান জমিতে পাট চাষ করতে বাধ্য করা

হয়। ফলে খাদ্য-সংকট দেখা দেয়। সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, খাদ্যে আমরা স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতার পূর্বে, দেশে যেখানে পাঁচ কোটি টন খাদ্যশস্য হত, এখন তার উৎপাদন বেড়েছে প্রায় পনের কোটি টন। আসলে, স্বাধীনতার পর চার দশকে জাতীয় আয় ৩·৬ গুণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে ব্যাপক হারে। ফলে গড়পড়তা বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১·৭ গুণ। তাতে কতখানি দারিদ্র্য দূর হয়েছে বোঝা যায় না। 'দারিদ্র্য-সীমা'-র সংজ্ঞার্থ এখন বদলানো হলেও বর্তমানে প্রায় ৭৬ কোটি জনগণের মধ্যে প্রায় ২৮ কোটি লোক এই 'দারিদ্র্য-সীমা'-র নিচে। সরকারি হিসাবেই ভারতের চব্বিশ কোটি মানুষের দু'বেলা ঠিকমত খাবার জোটে না।

দেশে সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা, হরিজন-নিগ্রহ, ধর্ম নিয়ে রক্তপাত এখনও প্রবল। অথচ গান্ধীজী হত্যার সাতদিন আগে আলিগড়ে ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ভিত্তিতে জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে জানান—"You are Muslims and I am a Hindu. We may adhere to different religious faiths or even to none ; but that does not take away from that cultural inheritance that is yours as well as mine. That past holds us together ; why should the present or the future divided us in spirit ?

[ Jan. 24, 1948 ]

দেশের সমস্ত বিভেদের মধ্যে জাতীয় সংহতি আনয়নের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বহু বছর আগে বলেছেন, "আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই— যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরান-ও নাই। অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম একত্বরূপ সেই ধর্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে।" অথচ আজও বাবরি মসজিদ, মীরাট দাঙ্গা-র সমস্যা আমাদের বিব্রত করে। প্রতি বছর ভারতে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ শিশু জন্মাচ্ছে—যা অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান! দেশের এই জন-বিস্ফোরণ, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক হিংসা, রক্তপাত, রাজনৈতিক কোন্দলের নিদারুণ রূপ দেখেই প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন, "Where Vivekananda had sown, gandhiji and Netaji reaped. If the final acnievement fell far short of expectation, it was because India's leaders had not read Vivekananda aright."

দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন ভারতে মাত্র এগারটি প্রদেশ ছিল। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতি অনুযায়ী এখন পঁচিশটি রাজ্য হয়েছে। অথচ আরও রাজ্য গঠনের দাবি উঠেছে। ভাষাবিজ্ঞানী গ্রিয়ারসনের মতে—ভারতে মোট উনআশিটি

ভাষা এবং পাঁচশো চুয়াত্তরটি কথ্যভাষা প্রচলিত। তাদের মধ্যে পনেরটি ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়দের শতকরা তিরানব্বই জন এই পনেরোটি ভাষার মধ্যে এসে যায়। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংখ্যালঘু ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতির দাবিতে নানা আন্দোলন (এবং তা অনেক সময় হিংসাত্মক) গড়ে তোলা হচ্ছে। এই সংকীর্ণ বিচ্ছিন্নতার ভাবনা থেকেই গোর্খাল্যাণ্ড বা ঝাড়খণ্ডের দাবি দানা বাঁধছে। ১৯৭৯-'৮০ খ্রীস্টাব্দের এক রিপোর্টে ভারতে আড়াই শো উপজাতির কথা বলা হয়েছে। সেই উপজাতির নরনারীরা একশো পাঁচটি ভাষায় এবং দুশো পঁচিশটি উপভাষায় কথা বলেন। ঐ সব ভাষা-উপভাষার সমর্থক নরনারীরা যদি স্বকীয়তার ভিত্তিতে পৃথক পৃথক রাজ্যগঠনের দাবি জানান, তবে ভারতের সংহতিভাবনা কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

১৯৮৫-র ২৭ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর বোম্বাই নগরীতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের শতবার্ষিকী অধিবেশন হয়। প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৮৩-র ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় কংগ্রেসের ৭৭তম প্রকাশ্য অধিবেশনে তার একটি রূপরেখা সমন্বিত সর্বসম্মত প্রস্তাবে ঠিক হয়—"...the centenary of our organization, The Indian National Congress will be celebrated in 1985. The history of the Congress is a saga of India's struggle for freedom with no parallel in the world. The achievements of Independence, its preservation, and the subsequent socio-economic upliftment of the country were indeed stupendous tasks. The lead given by the party and the nation's response are unprecedented. It is therefore our duty to remember on this occasion the great pioneers of the Congress organization and the untold sacrifices by hundreds and thousands of workers and common people spread over several generations. The Congress calls upon the people in general and congress men in particular to make every effort to ensure that these celebrations and planned and organized throughout the country and abroad in the fitting manner so as to make this great organization a perpetual source of inspiration to future generations."

নানাবিধ বাধা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে কংগ্রেস তার অগ্রগতি অব্যাহত রেখে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান যথোচিত মর্যাদায় পালন করেছে; তবু তার ভবিষ্যৎ যাত্রার পথ নিরঙ্কুশ নয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে চুক্তির মধ্যে অনেক সময় মুক্তি খুঁজে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। মিজোরাম

ও আসাম বা অলম আপাতত শান্ত হলেও পাঞ্জাব-সমস্যা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন, নির্বাচিত সরকার, ফৌজি আভযান প্রভৃতি সব রকম পরীক্ষা যে সফল হয় নি, সে সত্যতা অনুভবের বাইরে নয় ; সেই সঙ্গে গোর্খাল্যাণ্ড সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের শিরঃপীড়া নয়, একটি জাতীয় সমস্যা। তবু আমরা আশাবাদী মন নিয়ে যেন বিশ্বাস রাখতে পারি—"জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা !"

বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ স্বদেশবিষয়ক কবিতা ছাপা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদৃপ্ত স্বদেশাত্মক রচনাংশ ব্যবহারের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাছে এবং বিবেকানন্দ-অনুরাগী মনস্বী লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছে কৃতজ্ঞ। এই সংকলনে স্বদেশ-পর্যায়ের কবিতাধারার পৌর্বাপর্য রক্ষার জন্য যে-সব কবিতা বা রচনাংশ ব্যবহৃত হয়েছে, সে-সব কবিতা বা রচনাংশের জন্য পরলোকগত অথবা জীবিত কবিদের প্রতি কিংবা রচনা-সংশ্লিষ্ট প্রকাশকদের প্রতি শ্রদ্ধাকৃতজ্ঞতার সঙ্গে অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করি।

এই সংকলনে সেকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি কবিদের ক্রমানুযায়ী ভারত বিষয়ক কবিতার একটি স্পষ্ট রূপরেখা গড়ে উঠবে—এ বিশ্বাস রাখি। তবু এই সংকলনে আরও কোন-কোন কবির লেখা-সংযুক্তির কথা উঠতে পারে ; সবিনয়ে জানাই নানা অসুবিধের তা করা যায় নি।

সংকলনকে এক জায়গায় থামতেই হয়। এই সংকলনে রামনিধি গুপ্ত-ডিরোজিও থেকে কালানুক্রমিক কবিদের শেষে আছেন তরুণ কবি মৃদুল দাশগুপ্ত। তারপর সংযোজন-পর্ব। স্বতন্ত্র। মহাত্মা গান্ধী থেকে ইন্দিরা গান্ধীর স্বদেশভাবনা। তারই মাঝে ইকবালের বিখ্যাত কবিতা ও তার অনুবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এর মতই ভারতের জাতীয় জীবনে মহম্মদ ইকবালের 'সারে জহাঁসে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা' গানটি [ 'তরানা য়ে হিন্দী' কবিতা ] আজও মর্মস্পর্শী। সংকলনের মূল সুর প্রকাশে সংযোজন-পর্ব নতুন মাত্রা আনবে আশা করি।
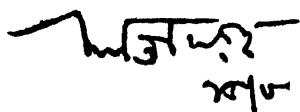
সংকলনটির গুরুত্ব বিধায় ও জিজ্ঞাসু মনের কথা ভেবে 'উৎস-সংকেত' অধ্যায়টি পরিশেষে সংযোজিত হল।

এই বিশাল সংকলনটি শোভনভাবে, সত্বর প্রকাশনার ব্যাপারে নিউ বেঙ্গল প্রেসের কর্ণধার শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার এবং তাঁর অগ্রজ শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার জাতীয় কর্তব্যবোধ-প্রসূত উদার আন্তরিকতায় এগিয়ে এসেছেন—এজন্য তাঁদের জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থপ্রারম্ভে সম্যক্ বিষয়ের ইঙ্গিতগর্ভ তাৎপর্য স্ব-কলমে ব্যাখ্যা করে সংকলনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন লেখকের লেখক, জাগ্রতবিবেকপ্রতিম, পদ্মভূষণ অন্নদাশঙ্কর রায় ; তাঁর প্রতি জানাই শ্রদ্ধাবিনম্র কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থটির প্রচ্ছদভাবনা ও অঙ্গসজ্জায় শিল্পী গৌতম রায় ও কবি-বন্ধু শান্তনু দাসের সহযোগিতা এবং

অন্যান্য ব্যাপারে নিউবেঙ্গল প্রেসের কর্মিবৃন্দের আন্তরিক সক্রিয়তা পেয়েছি ; এজন্য তাঁদের প্রতি প্রীতিবদ্ধ রইলাম। এ সংকলনের পিছনে আমার স্ত্রী শুক্লার নিরন্তর আন্তরিক সহযোগিতা এবং একমাত্র পুত্র শৌভিকের উৎসাহের কথা-ও পরিশেষে আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করি।

সংকলনটি দেশবাসীর কাছে যদি প্রিয় ও প্রেরণাসঞ্চারী হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত

[signature]

# সূচীপত্র

পাতা

পাতা

পাতা

পাতা

পাতা

॥ সংযোজন ॥

## THE PLEDGE

I am an Indian. India is my country. Every Indian is my brother. I'll always remain an Indian in thought, action and spirit.

I pledge that in all my thoughts and deeds, the safety, the honour, and the welfare of my country shall come first, always and every time. And that I shall do my best to promote justice, liberty, equality and fraternity.

**বাংলা-অর্থ :—**

আমি ভারতবাসী। ভারত আমার দেশ। প্রত্যেক ভারতবাসী আমার ভাই। চিন্তায়, কর্মে এবং সত্তায় আমি সর্বদা একজন ভারতবাসী।

আমি শপথ করছি—আমার সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে (আমার) দেশের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও কল্যাণ সদাসর্বদা অগ্রাধিকার পাবে। এবং (আমি) ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রসারের জন্য আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

———

## রামনিধি গুপ্ত

### স্বদেশী ভাষা

নানান দেশে নানান ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা
পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
ধারা-জল বিনে কভু
ঘুচে কি তৃষা ?
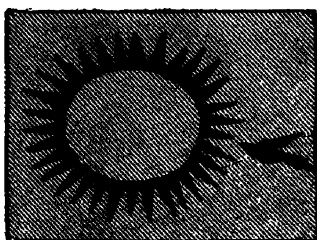
## Henry Louis Vivian Derozio

### TO INDIA—MY NATIVE LAND

My country ! in thy day of glory past
A beautious halo circled round thy brow
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold :
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! one kind wish from thee !
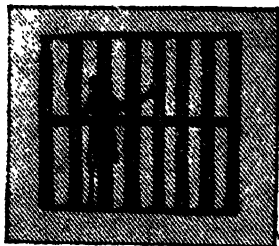
# হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

## স্বদেশ আমার

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা-সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী।

*[ অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ]
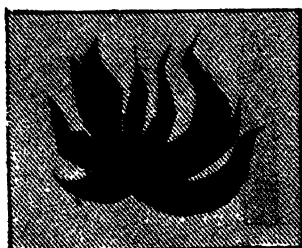
# হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

## ভারত আমার, স্বদেশ আমার

দূর অতীতের স্বর্ণপ্রহরে ঘিরেছিল মুখ বলয়রশ্মি
ভারত আমার! গরীয়সী দেশ, ছিলে যে সেদিন দেবীরই মতো
ঈগলের পাখা শৃঙ্খলে বাঁধা সে পড়ে রয়েছে পিছে সবার:
ব্যথাটুকু ছাড়া চারণের কাছে নেই আর কোন উপকরণ
গাঁথবার মতো কাহিনীরা সব হারিয়ে গিয়েছে ইতস্তত,
ধূলার গভীরে ডুবেছ ভারত, কালের ভূমিতে সমাধিলীন
আমাকেও সেই কালের ধূলায় ঝাঁপ দিতে দাও একটিবার,
খুঁজে নিয়ে আসি হারানো দিনের ভাঙা-চোরা কিছু নিদর্শন
চোখের সামনে নেই তারা আজ ভূমায় নিবিড় সে সব সৃষ্টি—
এই শ্রমটুকু দিয়ে বিনিময়ে অনভীপ্সিত মূল্যপ্রাপ্তি
তোমার মুখের আশীর্বচন, সেই শুধু হোক পুরস্কার॥

*[ অনুবাদ: ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত ]

[ জন্ম: ১৯৪০ ]

# ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

## স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি          জননী জনমভূমি
          যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে          সন্তানে জননী ভোলে
          কে কোথায় এমন দেখেছে॥
ভূমিতে করিয়া বাস          ঘুমেতে পূরাও আশ
          জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ          এই ধরা পড়িয়াছ
          জননী জঠর পরিহরি॥...
মিছা মণিমুক্তা হেম          স্বদেশের প্রিয় প্রেম
          তার চেয়ে রত্ন নাহি আর।
সুধাকরে কত সুধা          দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
          স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে          দেখ দেশবাসিগণে
          প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি          দেশের কুকুর ধরি
          বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
স্বদেশের প্রেম যত          সেইমাত্র অবগত
          বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাবতুলি ধ্যানে ধরে          চিত্তপটে চিত্ত করে,
          স্বদেশের সকল ব্যাপার॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে          চল সত্য ধর্মপথে
          সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা          পূরাও তাহার আশা
          দেশে কর বিদ্যাবিতরণ॥

[ সংক্ষেপিত ]

# ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

## ভারতের অবস্থা

এখন শুকায়ে দল ঝরিয়াছে সব।
নাহি গন্ধ মকরন্দ নাহি ভৃঙ্গ-রব॥
জাগ জাগ জাগ সব ভারত-কুমার।
আলস্যের বশ হয়ে ঘুমাও না আর॥

তোল তোল তোল মুখ খোল রে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন॥
রাত্রি আর কিছু নাই হইয়াছে ভোর।
যে দেখিছ অন্ধকার—কুয়াশার ঘোর॥

## মধুসূদন দত্ত

### ভারত-ভূমি

'Italia ! Italia ! O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza !'

Filicaia.

'কুক্ষণে তোরে লো হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।'

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
( হা ধিক্ ! ) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্মতি !
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি ?

## মধুসূদন দত্ত

### শুন গো ভারতভূমি

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়।
যে সময়, দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম-ঘোর, হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি ব্যাস, কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয় নিচয়।
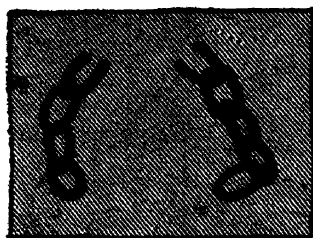
## রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

### হায় কোথা সেই দিন

হায় কোথা সেই দিন ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥
সব পুরুষার্থ-শূন্য কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদজ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত॥
নাহি সরলতা লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী॥
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন-প্রসূন।
কবে পুনঃ বীর-রসে জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ?
আর কি সেদিন হবে, একতার সূত্রে সবে,
বদ্ধ রবে মননে বচনে?
পূজিবে সত্যের মূর্তি, প্রণয় পাইবে স্ফূর্তি
সুখদ সরল আচরণে?

# রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

## স্বাধীনতা

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায় !
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে
স্বর্গ-সুখ তায় !
অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে
সাজ সাজ সাজ ॥
চল চল চল সবে, সমর সমাজে হে
সমর সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে
ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার ॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকু বংশে কত বীরগণ হে
কত বীরগণ।

পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্তি বিবরণ হে,
কীর্তি বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয় নন্দন হে ?
ক্ষত্রিয় নন্দন ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই ॥

[ সংক্ষিপ্ত ]
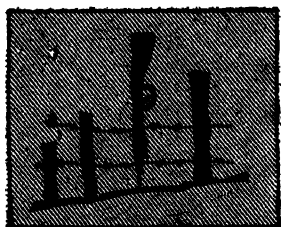
## মনোমোহন বসু

### জন্মভূমি

[ প্রবাসীর স্বদেশ-স্মরণ ]

আহা মরি ! 'স্বদেশ' কি সুধা-মাখা নাম !
মনে হয়, তার কাছে তুচ্ছ স্বর্গ-ধাম !
যে-স্থানে মায়ার বস্তু, সকলি আমার !
সুখের বিষয় যথা, অশেষ প্রকার !
যে-স্থানের পূর্বকথা, করিলে স্মরণ ;
অনুরাগে উথলিয়া উঠে প্রাণ মন !
যেখানে আমার পিতা, পিতামহগণ,
বংশের মর্যাদা সদা করিয়া পালন,
চিরদিন করি মান, যশের বিকাশ,
পুরুষে পুরুষে সুখে, করেছেন বাস !
ফুলের সৌরভ সম, কুলের গৌরব,
যথা চির-ব্যাপ্ত ! যথা জ্ঞাতি বন্ধু সব !
এত প্রেম, ভক্তির বন্ধন, যেই স্থলে—
আহা ! আহা !
আর কি এমন স্থান, পাব ধরাতলে ?
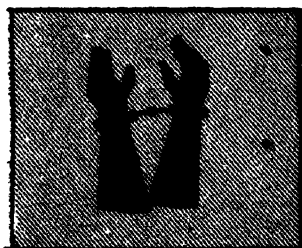
## মনোমোহন বসু

### দিনের দিন সবে দীন

দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন !
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অপমানে তনু ক্ষীণ !

সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে,
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র সূর্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন !

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন !

তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে
সারা শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগে খোসা ভুষি শেষে
হায় গো, রাজা কি কঠিন !

তাঁতি কর্মকার, করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হলো কি দেশের দুর্দিন !

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ ?
ধরবে কি লোকে তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্‌ ?

ছুঁচ সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই-কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন !
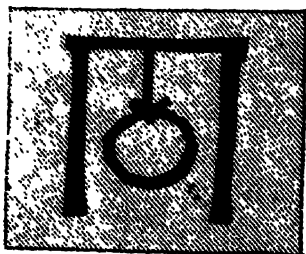
# বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

## এই কি সেই ভারত !

বল এই কি সেই ভারত !   বল এই সেই ভারত হে ॥

যে ভারত-বৃক্ষে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ
ফলেছিল সুশোভিত কত।

যে ভারতের বস্তু চন্দ্র-সূর্য-তারা,
অগ্নি-বায়ু-বারি-বজ্র-বিদ্যুৎধারা,
যে ভারতের কীর্তি গায় মহাভারত।

যে ভারতে শত শত মুনি-ঋষি,
যাগ-যজ্ঞে রত ছিলেন অহর্নিশি,
যে ভারতে ছিলেন সর্বাপদবিনাশী,
তত্ত্বদর্শী মহেশাদি দেব যত।

যে ভারতে ছিল বেদাদি প্রধান
যে ভারতে ছিল ব্রহ্ম-অনুষ্ঠান,
যে ভারতে সদা হ'ত সামগান,
যে ভারত ছিল নিত্যোৎসবে রত।

যে ভারতে ছিল সর্ব কর্মে ধর্ম,
আহারে বিহারে ব্যবহারে ধর্ম,
জীবনে ধর্ম, মরণে ধর্ম,
যে ভারতে কর্তেন ধর্মরাজ রাজত্ব।

এই কি সেই তেজঃপুঞ্জ আর্যস্থান ?
কার্য দেখে কিছুই হয় না অনুমান,
মনে হলে পরে জ্বলে উঠে প্রাণ,
বলব কি আর মনে রইল মনোগত।

# বিহারীলাল চক্রবর্তী

## সমুদ্র-দর্শন

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী, তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা
কপটে অনা'সে এসে রাক্ষস দুর্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা।

হা হা মাত, আমরা অসার কুসন্তান,
কোন্ প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা !
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজল-নয়না !

যেন তুমি তপোবন-বাসিনী হরিণী,—
দৈবাৎ পড়েছ গিয়ে ব্যাঘ্রের চাতরে,
ধুক্ ধুক্ করে বুক, থরথর প্রাণী,
সতত মনের ত্রাস কখন কি করে !

দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহা জলধি,
গাহিতে তোমার গান, এল একি গান !
যে জ্বালা অন্তর-মাঝে জ্বলে নিরবধি,
কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান।

[ সংক্ষেপিত ]

## সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

### মাতৃ-স্তুতি

জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ,
জননী এ সকল কারণ ;—
যাঁর প্রেম-সিন্ধু পরে, মায়ার তরঙ্গ ভরে,
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল কামনা !—
হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা ?
পেতে সুত সুলক্ষণ, কত ব্রত-আচরণ,
কত বা মনন দেবতায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

বিরলে বসিয়া করি যখন চিন্তন,
সিন্ধুজলে তরঙ্গ যেমন,—
হৃদে তব স্নেহ কথা, একে একে উঠে তথা,
যত স্মরি তবু না ফুরায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

বিলোকন তব রূপ হয় কল্পনায়,—
রত্নবেদী, বসি তুমি তায়,
বিশুদ্ধ প্রেমের ছবি, অনল তরুণ রবি,
রত্নবাসে বিজড়িত কায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

# বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## বন্দে মাতরম্

[ মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা,—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।" ভবানন্দ আবার গাহিলেন,— ]

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী;
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম।

## হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

### ভারত-সঙ্গীত

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি ;
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।

"মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য নিজ বীর্যবলে
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে.
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

"মধ্যস্থলে হেথা আজন্ম পূজিতা
চির বীর্যবতী, বীর-প্রসবিতা
অনন্ত-যৌবনা য়ুনানীমণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি,
সাগর-ছেঁচিয়া মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়॥

"আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি ?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

"বাজ্ রে শিঙা, বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।'

এই কথা বলি মুখে শিঙা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গায়িতে লাগিল জনৈক যুবা।

আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হাঁনিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস ?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা !

"আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা ?

"ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার !

"হীনবীর্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহা কুতূহলী,
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার

"এসেছিল যবে আর্যাবর্ত্তভূমে,
দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব-পিতৃগণ,
যখন তাহারা করেছিল রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাঁহারা ক'জন ছিল ?

"আবার যখন জাহ্নবীর কূলে
এসেছিলা তাঁরা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্মদা পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্যবনে ;
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাঁহারা ক'জন ছিল ?

"এখন তোরা যে শত কোটি তার
স্বদেশ-উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

"তবে ভিন্ন জাতি শত্রু-পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে ?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল !

"সেই আর্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনও উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনও ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

"কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু বীর দর্প, বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ?

"সকলি তো আছে, সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা !

"হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি !
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি !
আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদ-ভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে !"

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে—

"এখনও জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখনও সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবি-কর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
করি দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

"জপ, তপ, আর যোগ-আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর্ রে পূজা !

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও!

"তবে সে পারিবে বিপক্ষে নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

"ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

"এখন সেদিন না হ'ক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না,—হবে না—খোল্ তরবার ;
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

"অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হওরে উন্মদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

"কিসের লাগিয়া হলি দিশাহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমনি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ?

"ওই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

"সেই আর্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনও উন্নত,
সেই জাহ্নবী বারি এখনও ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

"বাজ্ রে শিঙা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"
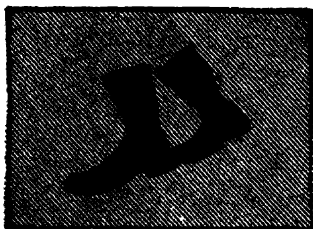
# হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

## রাখি-বন্ধন

[ কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত ]

কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে—
ভারতজননী জাগিল !
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপালে জ্বলিল !

মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল !
ভারতজননী জাগিল !

পূরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্‌মাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচি, মাদ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।

প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি করিল।

প্রণয় বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে—
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত-জগৎ মাতিল।

আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি-সিংহাসনে,
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল,—

পূরব বাঙ্গালা, অউধ, বিহার,
দূর কচ্ছ দেশ, হিমাদ্রির ধার,
তৈলঙ্গ, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
মা বলে ভারতে ডাকিল।

যোগনিদ্রা শেষ জননীর তায়,
হাসি মৃদু হাস নয়ন মেলায়,

নবীন কিরীট নব শোভাময়
যেন জ্যোৎস্নারাশি ভাতিল।
ভারতজননী জাগিল।

গাও রে যমুনে, ভাসায়ে পুলিনে,
গাও ভাগীরথী ডাকি ঘনে ঘনে,
সিন্ধু গোদাবরী গোমতীর সনে
ভুবন জাগায়ে গাও রে—
"যোগনিদ্রা শেষ আজি ভারতের
ভারত-জননী জাগে রে!"

আর নহে আজ ভারত অসাড়,
ভারত-সন্তান নহে শুষ্ক হাড়,
দ্রাবিড় পঞ্জাব অউধ বিহার
এক ডোরে আজ মিলিল।

ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহ্বল
চাহিছে মায়ের বদন-মণ্ডল,
দেখ্‌রে মুহূর্তে ভারত-কঙ্কাল
জীবনের স্রোতে ভরিল।

আজি শুভক্ষণে ভারত-উত্থান
এ দেউটি কভু হবে কি নির্বাণ?
হে ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান
হের দুখ-নিশি পোহাল!

শত হৃদি বাঁধা একই লহরে
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে
হিমগিরি আজি মিলিল;—
ভারতজননী জাগিল।

দেখ্‌রে কিবা সে উজল নয়ন
উৎসাহ-ভাসিত মানব ক'জন
দৈববাণী যেন করিয়ে শ্রবণ
জীবনের ব্রতে নামিল।

জয় জয় জয় বল রে সবাই—
পূরবী পঞ্জাবী আজি ভাই ভাই—
সম তৃষানলে আশাপথে চাই—
একতার হার পরিল,—

ধন্য রে 'বৃটন' ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ যুগান্তের অমানিশি ঘোর
তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন।
এ সখ্য-বন্ধনে বাঁধিল!

হবে কি সেদিন হবে ফিরে ফিরে
বিশ কোটি প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে
হয়ে এক প্রাণ, ধ'রে এক তান
ভারতে আপনা চিনিবে।

বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা
ভারত-সন্তান জানিয়ে আপনা,
চিনিবে স্বজাতি—স্বজাতি-কামনা,
আপনার পর জানিবে!

আর কেন ভয়—হের তেজোময়
ভারত-আকাশে নব সূর্যোদয়
নবীন কিরণ ঢালিল,
ভারতের চির ঘোর অমানিশি
তরুণ কিরণে ডুবিল!

গাও রে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে
গাও ভাগীরথী ডাকি স্বনে স্বনে
গাও রে যামিনী পোহাল !
সবে বল জয় ভারতের জয়
ভারতজননী জাগিল।

যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর
কে নহে রে আজ রোমাঞ্চ-শরীর
কার না নয়ন তিতে রে ?

সহস্র বৎসর গোলামের হাল,
ভারতের পথে এত যে জঞ্জাল
আজি তার ফল ফলে রে !

জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ 'রাখি'-বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির-মনোরথ
পূরাবার তরে চলিল।

যে নীরদ উঠি 'রীপন'-মিলনে
শুষ্ক তরু-ডালে সলিল-সিঞ্চনে
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি রে ফুটিল !

জয় ভারতের জয়
গাও সবে আজ প্রমত্ত-হৃদয়
ভারতজননী জাগিল ॥

# গোবিন্দচন্দ্র রায়

## ভারত-বিলাপ

কতকাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ-হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হলে
পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর-হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ, আসন, আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু আপণ রে।
পর দীপশিখা, নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

পর বেশ নিলে, পরদেশ গেলে
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে।
লভিয়ে বল বুদ্ধি, পরের বশে
হত জীবন চা অহিফেন চষে।
শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে
উপযুক্ত হলো পর-সেবা লেগে।
হলো চাকরি সার, যথায় তথায়
অপমান সদায় কথায় কথায়।
শুনিবে বল কে, তব আপন কে
পরদাস-দশায় বধির সবে।

অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।
কহিতে বুক চায় দু'ভাগ হতে
নয়নে উথলে জল স্রোত-শতে।
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষমতে
সহিতেছ নিরন্তর ঘাট-পথে।
নিজ ছায়া পড়ে, পর-কায়ে সদা
রহ ভীত পদে পথ-পাশে সদা।
পড়িলে পর তুঙ্গ-তুরঙ্গ-মুখে
হয় চাবুক চূর্ণ কপাল বুকে।
কি করে গুণগ্রাম, সহস্র ঘটে
শির না লুঠিলে রুটি নাহি ঘটে।
পরে ব্রহ্ম বধে, তৃণ নাহি নড়ে
তব ভ্রান্তি হলে ভূমিকম্প ধরে।
উলটে পৃথিবী, পরগা-পরশে
সুখ শান্তি লভে তব কায়-রসে।
আজি যে-টুকু মান লভে কুকুরে
ঘটে সে-টুকু না তব বাসী নরে।
করি যেমন কাটিছ, রাত্রি দিবা
জীবনে-মরণে বল ভেদ কিবা।
মন চায় কষায়, কৌপীন পরি
তব দুঃখ গেয়ে সব দেশে ঘুরি।

[ সংক্ষেপিত ]

# সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ভারত-সঙ্গীত

১

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান ॥

২

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি কত মণি-রত্নের নিধান ॥
হোক ভারতের জয়
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয় ॥
কী ভয়, কী ভয়
গাও ভারতের জয় ॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা দময়ন্তী পতিব্রতা
অতুলনা ভারত-ললনা ॥
হোক ভারতের জয়
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয় ॥
কী ভয়, কী ভয়
গাও ভারতের জয় ॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস
কবিকুল ভারত ভূষণ॥
হোক ভারতের জয়
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়॥
কী ভয়, কী ভয়
গাও ভারতের জয়॥

৫

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর যে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি॥
হোক ভারতের জয়
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়॥
কী ভয়, কী ভয়
গাও ভারতের জয়॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ
ভারতের ছিল সেতু রিপুদল ধূমকেতু
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়
কী ভয়, কী ভয়
গাও ভারতের জয়॥

কেন, ভয়, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়

যতো ধর্মস্ততো জয়

ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল

মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?

হোক ভারতের জয়

গাও ভারতের জয়

কী ভয়, কী ভয়

গাও ভারতের জয় ॥

[ ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হিন্দুমেলার
২য় বার্ষিক অধিবেশনে গীত ]

## দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

### ভারত-ললনা

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও বীরজায়া, বীর-প্রসবিনী।
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর-গুণগাথা, বিক্রম-কাহিনী,
স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীরগর্বে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহাসাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

## নবীনচন্দ্র সেন

### ভারতের তপোবন

ভারতের পুণ্যাশ্রম, মহাতীর্থ সব!
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস!
সংসার-সমুদ্রে তীর! আকাঙ্ক্ষা-লহরী—
অনন্ত অসংখ্য,—নাহি প্রবেশে হেথায়।
নাহি ফলে হেথা কভু সুখ দুঃখ ফল
বিষয়-বাসনাবৃক্ষে; নাহি ফুটে ফুল
পাপের কণ্টক বৃন্তে চিত্তমুগ্ধকর।
নাহি হেথা সুখ-দুঃখ, শান্তিতে বিষাদ,
প্রেমেতে স্বার্থের ছায়া, দারিদ্র্যে দহন।
ভারতের তপোবন! পাপ ধরাতলে
স্বরগের প্রতিকৃতি! কয়টি নক্ষত্র
আঁধার ভারতাকাশে, জ্ঞানের আলোক
ঘোর মূর্খতা আঁধারে! নীরব, নির্জন,
এই তপোবন হতে যখন যে জ্যোতিঃ,
পার্থ! হয় বিনির্গত, সমস্ত ভারত
ঝাঁপ দেয় তাহে, ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
ধর্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,
যে যে মহামন্ত্রবলে হতেছে চালিত
সমস্ত ভারতবর্ষ, সকলি—সকলি—
নীরব নির্জন এই আশ্রমপ্রসূত।

[ 'রৈবতক'-এর অংশবিশেষ ]

# জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

## চল্ রে চল্ সবে

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান !
বীরদর্পে পৌরুষ-গর্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ !
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন ?
উঠ, জাগো, সবে বল—মা গো !
তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ্ ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোর এক।

এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাও রে আন্‌তে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ যাহা ধ্রুব, ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইতে একতা-নিশান।

## জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

### এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়;
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িয়ে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়॥
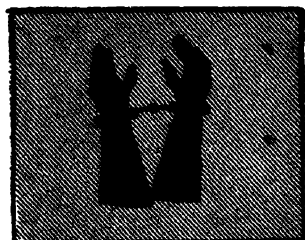
## রাজকৃষ্ণ রায়

### ভারতজননী

দিবস বিগত, তবুও ভারত!
নহিল বিগত দুঃখ তোমার?
রজনী আইল, আবার ছাইল
শোকের উছাস মুখ তোমার।
পূবের আকাশে আঁধার ধায়,
বদন তোমার আঁধার তায়
তপত করিছে শীতল বায়
দুঃখ-নিপীড়িত বুক তোমার।
শিশির-শীকর ঝরে ধীরে ধীরে,
শরীর তোমার ভাসে আঁখি-নীরে,
আরো কতদিন, তরে দুখিনি রে
দুখ-নীরে পড়ি দিবি সাঁতার!
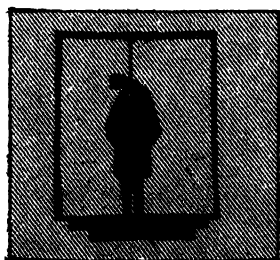
## আনন্দচন্দ্র মিত্র

### উঠ উঠ উঠ সবে ভারত-সন্তানগণ

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ।
থেকো না থেকো না আর মোহনিদ্রায় অচেতন॥
পোহাইল দুঃখনিশি, সূর্য-মুখ ঐ রে
পথিক বলে হাসিতেছে দেখে রে মেলে নয়ন।

ঘোরতর অন্ধকার, পাপ নিশাচর আর,
ঐ দেখ পোহাইল আর দুঃখ রবে না।
জ্ঞানালোক প্রকাশিত, সুপবন বহিল,
ভারত-কাননে ডাকে আশা-বিহঙ্গিনীগণ॥

সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চলে সবে সযতনে
আলস্য ঔদাস্য বশে আর কেহ থেকো না;
প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে
ভাসাও জীবনতরী কর শীঘ্র আয়োজন॥
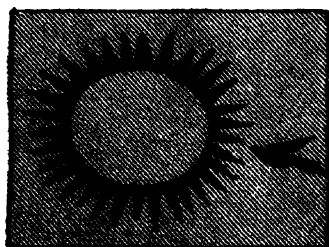
# হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

## ভারত-রাণী

তুমি মা ভারত-রাণী, নহিলে জগতে আর
এত শ্রী-সম্পদরাশি, কোথা আছে সুষমার?
সভ্যতার এ জগতে তুমি যে মা বিজয়িনী;
বিদ্যাবুদ্ধি অধিষ্ঠাত্রী, তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিনী।
আমি বাণী তব গৃহে ধরি বীণা অবিরত,
গায়িল মা, কবি-কণ্ঠে তোমার মহিমা শত।
পদ্মরাগ মরকত হিরণ্য হীরক হার,
তব কণ্ঠে আসি রমা পরাইল অনিবার।
স্বর্গ হ'তে মন্দাকিনী ঝরি স্রোত-জলে চুমি',
করিয়াছে পুণ্যময় মা তোমার দেবভূমি।
বালার্ক কিরণে মাখি বিসর্পিত শ্যাম কায়,
পুণ্যজলে তব অঙ্কে কৃষ্ণতোয়া বহে যায়।
তোমার আকাশ বিনা কোথায় মা, নীলাকাশে
নির্মল রজতে মাখা হেন ফুল্ল চন্দ্র হাসে?
কোথায় মা হেন দেশ যেখানে লাবণ্যধাম
মনোময়ী প্রকৃতির চারু চিত্র অভিরাম?
কোথায় মা, আসি বল আপনি প্রকৃতি-রাণী
সাজাইল নানারূপে তার বিধুমুখখানি?
সেই মা ভারত তুমি, যেখানে মা নিরন্তর
খরতাপে বিভা নিত্য ঢালে প্রভাকর।
যেখানে নীরদ শ্যাম করে মৃদু গরজন,
দামিনী চমকি রূপে আলো ঝরে ত্রিভুবন।
ময়ূর-চন্দ্রকে যথা শত চন্দ্র পরকাশ
কোকিলের কুহু কণ্ঠে জাগে প্রাণে অভিলাষ।

আমরণ যথা নারী সতী সাধ্বী পতিব্রতা,
পতি সঙ্গে হাসিমুখে হয় মাগো অনুমৃতা।
যথা গৃহ অন্তরালে নারী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী
মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা চিরধর্ম-সহায়িনী।
যথায় কামিনী, চাঁপা, কুমুদ, কহ্লার হাসে,
বার মাস সমীরণ বহে শত ফুলবাসে।
সেই মা ভারত তুমি দীপ্ত শত মহিমায়
নইলে মা এ ঐশ্বর্য কার আছে বসুধায়?
তোমারি মা দেবভূমে আসি হরি দয়াময়
কতবিধ রূপ ধরি করিল মা অভিনয়।
প্রথমে ভাসিল মহী 'প্রলয়-পয়োধি-জলে'
মীনরূপে চতুর্বেদ উদ্ধারিল কুতূহলে॥
কূর্মরূপে পৃষ্ঠদেশে আনন্দে মন্দর ধরি—
মন্থিল মা তব সিন্ধু দেবাসুরে যত্ন করি।
মহাকায় বরাহের দংষ্ট্রা ধরি বসুমতী
জলমগ্নে মা তোমায় রাখিল যে পুণ্যবতী।
তোমারি মা পুণ্যক্ষেত্রে নরহরি রূপ ধরি
রক্ষিলা যে ভক্ত হরি অসুরে বিদীর্ণ করি।
কোটি চন্দ্রপ্রভা মুখে, মা, তোমার পুণ্যদেশে
আপনি আসিয়া হরি অতি খর্বতর বেশে
মাগিয়া ত্রিপাদভূমি নভঃস্থল বসুধায়
ব্যাপিল কমল পদে পূর্ণব্রহ্ম মহিমায়।
ভৃগুপতি রূপে আসি কোটি-নররক্ত-জলে
বহাইল মা প্রবাহিণী খরতর করবালে।
বুদ্ধরূপে রুদ্ররূপে সম্বরিয়া পুনর্বার
'অহিংসা পরমধর্ম' করিল মা সুপ্রচার।
রামরূপে দেখাইল প্রেম-প্রীতি-ভক্তিচয়
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণরূপে দেখাইল ধর্মে জয়।

# গোবিন্দচন্দ্র দাস

## স্বদেশ

১

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ´ কারে এ দেশ তোমার নয় ;–
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ´ কারে, এ দেশ তোমার নয় !

২

এই যে ক্ষেতে শস্যভরা, তোমার এ নয় একটি ছড়া,
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠী,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয় !

৩

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ´ কারে এ দেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ি, এই যে পেলেস—এই যে বাড়ি,
এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট ছোটলাট তারাই সবে, জজ মাজিস্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় !

৪

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে এ দেশ তোমার নয়!
আইন-কানুনের কর্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ-ভরা সুখ-সুবিধা তাদের ভারতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরজুড়ি
তাদের চার্চে তাদের নাচে তাদের বলে ব্যয়;
একশ রকম টেকস দিবা, ব্যয়ের বেলা তোমার কিবা
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের করে ভয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়!

৫

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোমার নয়!
যে-দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বলতে পারে,
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়?
যে-সব বাবু বিলাত গিয়ে, বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আন্‌ছে তাদের শাবক সমুদয়,
'বৃটিশ বরণ' বলে দাবি কর্লে নাকি বিলাত পাবি?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠি তোরা নাইক লজ্জা ভয়!
এই যদি রে 'বৃটিশ বরণ' লজ্জা কারে কয়?

৬

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়,
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ির ভিতর কাপড় কেড়ে লয়?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ কানা-খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা পাঙ্খাকুলী—পীলা ফাটার ভয়!
কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয়?

৭

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
'যাহার লাঠি তাহার মাটি' চিরদিনের কথা খাঁটি,
এ ত নহে চা'র পেয়ালা চুমুক দিলে জয়!
দেখতে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপনি মরে,
ঘুষির বদল খুশি করে—'সেলাম মহাশয়!'
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এ দেশ তোদের নয়!

৮

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
সোনার বাঙলা সোনার ভূমি হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আসবে কোলে, এই কি মনে লয়?
'সোনা' 'যাদু' মিষ্টিভাষে, ছেলেমেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়!
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভবি' মহাশয়!

৯

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের বেঙ্কে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয়!
তাদের কলে তোরাই কুলি, তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি,
তোদের কেবল ভিক্ষাঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়!
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়!

১০

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়,
কিসের বা তোর নেপাল ভুটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান,
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয়!

অই যে ওদের 'কাটামুণ্ড' সত্যই ও কাটা মুণ্ড,
রাহুর যেমন মরা তুণ্ড হা করিয়ে রয়!
কেতুর মত পুচ্ছ লুটান ভুটান মহাশয়!

১১

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়,
করদ মিত্র—নবাব রাজা, সবাই দেখি দক্ষ সাজা,
একটাও নয় মানুষ তাজা—অজার মাথা বয়,
ওগুলা সব মানুষ হলে, কোন্ দিকে কে যেত চলে,
ডেনিস পেনিস টেনিস খেলে ভারতভূমি লয়?
মরুদেশের গরুকাটা ভারত করে জয়?

১২

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে এ দেশ তোদের নয়,
যখন বাদশা মুসলমান, তখন তাদের 'হিন্দুস্থান',
ইংরেজ 'ইণ্ডিয়া' বলে এখন কেড়ে লয়!
অযোধ্যা কই—'আউধ' এ যে, দাক্ষিণাত্য 'ডেকান' সে যে,
'সিলনে' গিয়েছে লঙ্কা—মুক্তা মণিময়!
ডমাউন আর ডিউ গোয়া, চুণিপান্না সোনার মোয়া,
যায় না তাদের ধরাছোঁয়া—কে দেয় পরিচয়?
বারণাবত—ইন্দ্রপ্রস্থ, কই সে তোদের সে সমস্ত,
'দিল্লি'-র 'ডীল্লি' হলো, আরো বা কি হয়!
স্বদেশ বলে কর্লে দাবি, আর কি তোরা এ দেশ পাবি?
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির হর্ষময়!

১৩

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে এ দেশ তোদের নয়,
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ—কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম বিত্থালয়?

কোথায় বা ব্রহ্মচর্য, অসীম স্থৈর্য, অসীম ধৈর্য,
কই বা উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয়?
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে, কোটি কোটি, লক্ষে লক্ষে,
কই সে তাদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়,
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
স্পর্শ থাকুক দর্শনে তার শত্রুকুলক্ষয়!
লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্ত-বীরের মাংস রক্ত,
তাদের বুকে অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাবর্তে প্রথম আসি, তাইতে তারা দৈত্য নাশি,
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয়!
তাদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়।

# গোবিন্দচন্দ্র দাস

## আমরা হরিহর

১

আমরা হরিহর,
আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হৌক না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সদিয়া সিন্ধু সেতু-রামেশ্বর,
আমরা নাগা আমরা গারো
কেহই ত পর নহি কারো,
খড়গী বর্গী গুর্খা জাঠ্‌ আর পার্শী সওদাগর।

পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা?
কেউ বা কালো কেউ বা রাঙ্গা একই কলেবর
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্ত মাংস আমরা পরস্পর।

২

আমরা হরিহর,
একই সলিল একই বায়ু,
একই মৃত্যু পরমায়ু,
একই মোদের শীত বসন্ত একই দিবাকর।
একই মোদের ক্ষুৎপিপাসা,
একই ভরসা একই আশা,
এক আকালে এক পেলেগে মরি নিরন্তর।

পীলা কাটে একই বুটে,
একই পিশাচ নারী লুঠে,
একই ঘৃণা একই লাজে সবাই জর জর।
একই মোদের দণ্ডবিধি
একই মোদের গুণের নিধি,
এক চরণে তিরিশ কোটি লুঠি নারী নর।

একই ক্ষোভে একই রোষে,
সবার বুকে রক্ত শোষে,
গর্জে প্রাণে অপমানে বজ্র ভয়ঙ্কর।
এক মরণে আমরা মরি সবাই নারী নর।
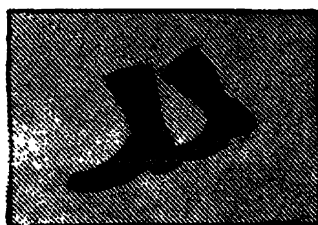
## অশ্বিনীকুমার দত্ত

### জয় ভারত-জননী

জয় জয় আর্যমাতা জয় ভারত-জননী।
জয় জগৎবন্দিনী মা জয় ভুবনমোহিনী॥
শুন গো মা দেশে দেশে
তব গুণ সবে ঘোষে,
প্রণমি চরণে মাগো তুমি শ্রীবিদ্যারূপিনী
আজি জর্মনি বিলাতে
ফরাসী আমেরিকাতে,
কত লোকে গায় মাগো তব গুণকাহিনা
আর্য বীর্য কার্য যত
দেখি সবে চমকিত
সমস্বরে বলে, তুমি রত্নপ্রসবিনী॥
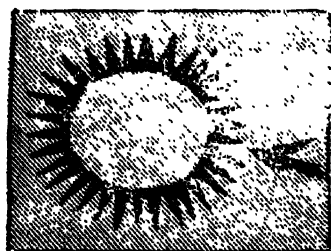
# অশ্বিনীকুমার দত্ত

## আয় রে ভারতবাসী

(ঝিঁঝিট—একতালা)

আয় রে আয় রে ভারতবাসী, আয় সবে মিলে
প্রণমি ভারতমাতার চরণকমলে।
আয় রে মুসলমান ভাই, আজ জাতিভেদ নাই,
এ কাজেতে ভাই ভাই, আমরা সকলে।
ভারতের কাজে আজি, আয় রে সকলে সাজি,
ঘরে ঘরে বিবাদ যত, সব যাই ভুলে।
আগে তোরা পর ছিলি, এখন তোরা আপন হলি,
হইবে তবে গলাগলি, ভাই ভাই বলে।
ভারতের যেমন মোরা, ওরে ভাই তেমনি তোরা,
ভেদাভেদ যত কিছু, কোথা গেছে চলে।
আয় রে ভাই সবে মিলি, মাখি ভারতের ধূলি,
এমন আর পবিত্র ধূলি নাহি ভূমণ্ডলে।
এ ধূলি মস্তকে লয়ে ভাবেতে প্রমত্ত হয়ে
হিন্দু-মোস্লেম কাজ করিব, জাতিভেদ ভুলে।
এ ধূলিতে আকবর তোদের, এ ধূলিতে শ্রীরাম মোদের,
আরও শৌর্যবীর্য কত, মিশিয়াছে কালে।
ওরে ভাই এ ধূলির গুণে, খাটি সবে সবে প্রাণপণে;
ভারত দুর্দশা মোরা নাশিব সমূলে।
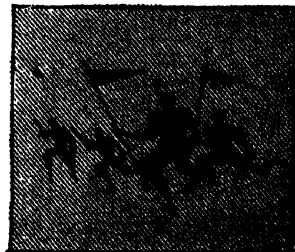
# অশ্বিনীকুমার দত্ত

## আয় সবে মিলে

আয় আয়, ভাই, আয় সবে মিলে,
হিন্দু-মুসলমান, জাতিভেদ ভুলে,
কাঁপায়ে অবনী, ভারত-জননী, করিছেন সবে আহ্বান।
আয় রে সকলে, আয় দলে দলে, করিতে হইবে দান—
ধন জন মান প্রাণ।

এখনও কি তোরা মড়া প'ড়ে রবি?
এখনও কি তোরা অপমান সবি?
উঠে ভাই দাঁড়া, পড়েছে যে সাড়া,
ভারত-ভুবনে উঠেছে ধ্বনি—
'বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।'

মানুষ বলে' মোদের গণে না যে ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
(মোরা) পরমুখে চাই, পরে দিলে খাই,
এ দুঃখ যে আর সহে না প্রাণে,
'বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।'

পুরাতন মোদের শিল্পকলা যত,
জাগাব নূতন, আনিব কত,
নূতন প্রাণে, নূতন তানে, গাইব সকলে নিত্য নব নব—
'বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্॥'

আবার এ দেশ ধন্য হবে ভবে,
জগতের আবার শিরোমণি হবে,
জয় জয় রবে ঘোষিবেরে সবে,
ভারত নবীন জীবনকাহিনী ;
'বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্॥'
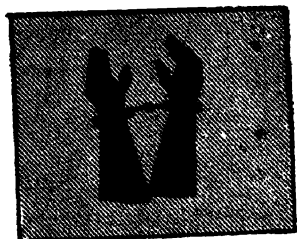
## যোগীন্দ্রনাথ বসু

### মানচিত্রে ভারতবর্ষ

শিক্ষক—হের বৎস ! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র। আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই। মাতৃস্তন্যে যথা
এ দেশের ফলে, জলে পালিত আমরা,
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত !

ছাত্র—( প্রণামান্তে ) ওই যে মানচিত্রের শিরে ঘন মসীরেখা
পূরব-পশ্চিম ব্যাপী রয়েছে অঙ্কিত,
কী নাম উহার, দেব, বলুন আমারে।

শিক্ষক—মসীরেখারূপে, বৎস ! ওই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র, কত সাধু জনে
বিরচি' আশ্রম সেথা, পূজি ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখে তোমার
বিজয়মুকুট-সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে ওই গৌরীশৃঙ্গ ; বাম দিকে তার
দেখ বদরিকাশ্রম, মহামুনি ব্যাস
বসি' যে আশ্রমমাঝে, রচিলা পুলকে
অমর "ভারত-কথা"। ওই দূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি' উদ্‌যাপন,
লভিল সমাধি যথা। এই হিমাচল
সাধু-পদরেণু বক্ষে ধরি' যুগ যুগ
হইয়াছে পুণ্যভূমি ; কর নমস্কার।

ছাত্র—ওই ঊর্ধ্বে বাম দিকে পঞ্চরেখাময়
শোভিছে যে দেশ, দেব! কী নাম উহার?

শিক্ষক—ওই পঞ্চনদ বৎস! এই পুণ্যভূমি,
আর্যদের আদি বাস, সাম-নিনাদিত;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত-ভূমি মরুময় স্থান;
প্রতাপের দেশ এই পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র—ওই যে চিত্রের মাঝে, কটিবন্ধসম
শোভিতেছে গিরিরেখা, কী নাম উহার?

শিক্ষক—ওই বিন্ধ্যাচল বৎস! উত্তরে উহার
আর্যভূমি আর্যাবর্ত! উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্যের বাস, অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারে পূর্ণ। মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য, আর্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে;
এবে জনপদ কত পূর্ণ ধনে-জনে
শোভিছে এ দেশ মাঝে। এই বনভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য; রঘু-কুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য জটা চীর-ধরি
কাটাইল কাল যথা। পুণ্য প্রবাহিণী
গোদাবরী কল-কল মধুর নিনাদে
'সীতারাম জয়'-গীতি গাহিয়া পুলকে
এখনও বহেন সেথা; পবিত্র এ-দেশ
সীতারাম পদস্পর্শে; কর নমস্কার।

ছাত্র—( নমস্কারান্তে ) গুরুদেব, কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণ যুগ। কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি এবে দেখান আমারে।

শিক্ষক—ওই বঙ্গভূমি বৎস! হিমাদ্রি আপনি,
মুকুট-আকারে হের শোভে শিরোদেশে,
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে।
'সুজলা', 'সুফলা,' 'শ্যামা', ভূষারূপে তার
হের ওই নবদ্বীপ; শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ সাঙ্গপাঙ্গ ল'য়ে
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুকতনু ওই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে। নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম ওই, পতিতপাবনী
তরিতে সগরবংশে অবতীর্ণ যথা
মূর্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ,
কর প্রণিপাত তুমি, বিধাতার কাছে
মাগ এই বর, বৎস! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।

ছাত্র—( প্রণামান্তে ) বিশাল এ চিত্র দেব, কৃপা করি' তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরও কিছু থাকে।

শিক্ষক—আছে শত শত বৎস! কী বর্ণিব আমি?
বর্ণিলে জীবনকালে না ফুরাবে তবু—
রত্নপ্রসূ মা মোদের। ভারতভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ
পুণ্যময় মহাতীর্থ। কি বলিব আর?

ভারত-সন্তান তুমি, করি আশীর্বাদ—
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারতমাতার
হও উপযুক্ত পুত্র; স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম, নিত্য রাখি' লক্ষ্য-পথে
হও বৎস, অগ্রসর! ভারত-জননী
করিবেন শুভ তব আশীর্বাদ-দানে।
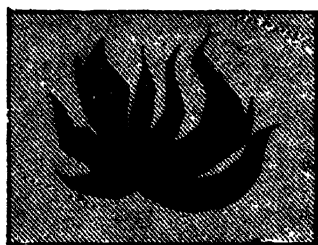
## যোগীন্দ্রনাথ বসু

### দেশভক্তি

সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভালো? স্বদেশ জননি!
কহি বটে, সাধনার ধন তুমি, নয়নের মণি!
কিন্তু যবে অন্তরের অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ,
বুঝি সব শূন্যগর্ভ, অর্থহীন অলীক বচন।
প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হয়ে কেন রব কতকাল?
পূত, শুদ্ধ কর মা গো, দূর কর মনের জঞ্জাল।
পারিতাম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমারে,
হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে?
দারিদ্র্যের কষাঘাতে কাঁদে ভ্রাতা, কাঁদে ভগ্নী মোর,
বিলাসে নিমগ্ন আমি, কই ঝরে নয়নের লোর?
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন,—
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্বালন?
কোটি কণ্ঠে রোগে শোকে শুনি উঠে তীব্র আর্তনাদ
আমি হাসি হা-হা ক'রে, নাহি চিন্তা নাহিক বিষাদ!
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয়;
দেশভক্তি ত্যাগে, ধর্মে, কর্মে, প্রেমে,—বচনেতে নয়।
বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হয়ে গেছে প্রাণ,
কর্মক্ষেত্রে শক্তি, স্ফূর্তি, অন্তর্যামী! কর মোরে দান।
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ!
সত্য সত্য বুঝি যেন মাতৃরূপা আমার স্বদেশ!
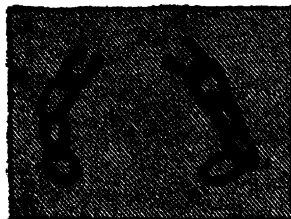
## রাইচরণ বিশ্বাস

### একবার জাগো

একবার জাগো, জাগো, জাগো, যত ভারত-সন্তান রে!
লোহিত বরণে পূরব গগনে, উদিত তরুণ তপন রে!
জাগিছে চীন, জেগেছে জাপান, নবীন আলোকে রে!
কাল-ঘুমঘোর ভাঙ্গিবে না তোর, অলস ভারত রে!
(আজি) পর-পদাঘাতে দলিতা লাঞ্ছিতা, দীনা কাঙ্গালিনী সে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'ল সোনার ভারত রে!
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার কিছু নয় রে
নবীন প্রভাতে নবীন প্রাণে নবীন তপন রে।
কোটী কণ্ঠস্বরে গাও উচ্চৈঃস্বরে বন্দে মাতরম্ রে!
শুনিয়া সে ধ্বনি স্বরগে অমনি হবে প্রতিধ্বনি রে!
শত বরষের অলস পরাণ, জাগিবে জাগিবে রে!
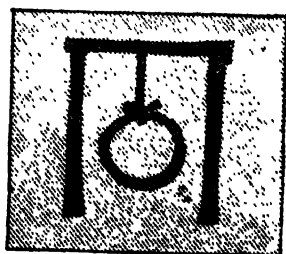
## দেবেন্দ্রনাথ সেন

### এস পূজি মা'র চরণ দুখানি

হিন্দু-মুসলমান হয়ে এক প্রাণ এস পূজি মা'র চরণ দুখানি
মর্মে বাজে ব্যথা, জন্মভূমি মাতা আমাদের দোষে আজ কাঙ্গালিনী।
মাতৃসেবা মহা পুণ্যেরই অভাবে কি দুর্গতি আজ দেখ ভাই ভেবে;
মাতা অন্নপূর্ণা, একি বিড়ম্বনা—অন্নাভাবে মরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী।
বর্ষে বর্ষে তায় দুর্ভিক্ষ পীড়ন, বর্ষশস্যে হয় ত্রিবর্ষযাপন
কারে বা বলিব, কে বুঝে বেদনা, কেহ নাই আর বিনা কাত্যায়নী!
ওঠ ওঠ ভাই, থেক না অলসে, মাতৃসেবা ব্রত লহ রে হরষে;
মা'র আশীর্বাদে, রব নিরাপদে, সম্পদে বিপদে কর মা-মা ধ্বনি।
ব্রতের নিয়ম শুন দিয়া মন—'একতা' 'সংযম' অতি প্রয়োজন,
স্বদেশ বাণিজ্যে উন্নতি সাধন ভুল না এ কথা মূলমন্ত্র জানি।
স্বদেশী দ্রব্যেতে জীবনযাপন, প্রতিজনে কর প্রতিজ্ঞা এখন,
প্রতি ঘরে ঘরে লহ সমাদরে স্বদেশীয় দ্রব্য উপাদেয় মানি।
'হুজুগে বাঙালী' বলে সবজন, এ কলঙ্ক ভাই করহ মোচন;
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' কার্যে পরিণত কর সিদ্ধবাণী।
শক্তিরূপা মাতা শক্তির আকর পূজ ভক্তিভরে জুড়ি দুই কর;
মা প্রসন্না হলে কিসে আর ভয় আদ্যাশক্তি মাতা অসুরঘাতিনী।
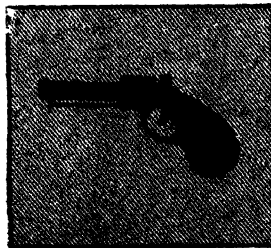
# গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

## আদেশবাণী

ঐ শোন শোন কাহার আদেশ
হতেছে ধ্বনিত বিষাণে
পূরব পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
নৈর্ঋতে অগ্নি ঈশানে।

সুখ-দুখ-শোক সকল পাসরি
চলেছে ছুটিয়া কোটি নরনারী ;—
রাজা মহারাজ দরিদ্র ভিখারী
মিলিয়া ধরেছে নিশানে।

চলেছে ভাসিয়ে যে তরঙ্গ-যানে
কার সাধ্য এরে ফিরায় শাসনে ;
বাধা-বিঘ্ন সারি পড়িবে প্রসারি
বিপুল জীবন-সঙ্গমে।

বাজ তবে শিঙা ঘন ঘন ঘোর,
বল ভারতের অমানিশা ভোর ;
যে আছে নিদ্রিত ভেঙে যাক ঘোর
নব-রবিচ্ছটা গগনে।

নগরে নগরে গ্রাম গ্রামান্তরে
কার স্তুতি-গীতি কম্পিত সমীরে ;—
পত-পত-পত পতাকার শিরে—
শোভিছে ভারত-গগনে ?

বাঙ্গালী-বিহারী-শিখ-উৎকল,
মারাঠা-পাঞ্জাবী-পাঠান-মোগল
চলেছে ধাইয়ে করি কোলাহল,—
কি জানি কাহার আহ্বানে।

বাজ ওরে শিঙা ভঁয় ভঁয় ভোঁম
চমকিয়া ধরা মরুগিরি ব্যোম;
বল—সত্য জয় জয়স্তু ধরম—
কি ভয় হৃদয়-মিলনে।

দেবের দুন্দুভি ভারত-গগনে
উঠেছে বাজিয়ে, ভয় কি মিলনে:
যেখানে একতা, সিদ্ধি সেইখানে
কি ভয় জননী-পূজনে।
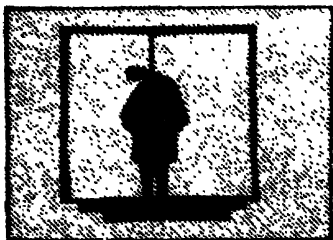
# গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

## শিবাজী-উৎসব

আজি গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ—
ভারতের কথা ভারতের গাথা
ভারত-বীরের যশোগান।
সদা বীর-প্রসূ ভারত-জননী
বীর-রত্ন-মালে কোহিনুর মণি
স্মর শিবময় শিবাজী-কাহিনী
সহায় ভবানী অমূল্য দান।
গাও গাও গাও খুলে মনপ্রাণ।
কত শিবময় সে শিব-কাহিনী
কত শক্তিময় সে শিব-বাহিনী
বলে শিব শিব জপ শিব-বাণী
নাশিবে অশিব সে শিব গান।
শিব শিব মন্ত্রে ভারত দীক্ষিত
গাও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত
হর-হর-হর পুণ্যময় গীত
কোটি কোটি কণ্ঠে মিলায়ে তান।
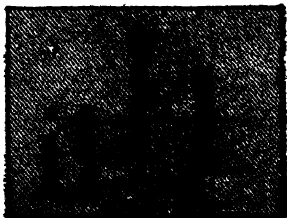
## কায়কোবাদ

### দেশের বাণী

কে আর বুঝিবে হায় এ দেশের বাণী ?
এ দেশের লোক যারা
সকলই তো গেছে মারা,
আছে শুধু কতগুলি শৃগাল শকুনি !
সে কথা ভাবিতে হায়
এ প্রাণ যে ফেটে যায়,
হৃদয় ছাপিয়ে উঠে—চোখ ভরা পানি।
কে আর বুঝিবে হায় এ দেশের বাণী !

এ দেশের লোক যত
বিলাস ব্যসনে রত
এ দেশের দুঃখ কিছু নাহি বুঝে তারা।
দেশ গেল ছারেখারে,
এ কথা বলিব কারে ?
—ভেবে ভেবে তবু মোর হয়ে গেছে সারা !
প্রাণভরা হাহাকার
চোখভরা অশ্রুধার,
এ হৃদি যে হয়ে গেছে মরুভূমি-পারা !
এ দেশের দুঃখ কিছু নাহি বুঝে তারা ?

এ দেশের ধান-চাল সবই যায় চলে।
কিছুই থাকে না দেশে,
ভিক্ষুকের বেশে শেষে
ঘেচু কচু খেয়ে মোরা ভাসি অশ্রুজলে!
শিশুগুলি কেঁদে মরে,
কেউ তো দেখে না ফিরে?
—এমন বান্ধব কেহ নাহি ধরাতলে!
এ দেশের যাহা কিছু সবই যায় চলে!

এ দেশের চাষা যারা
অন্ন বিনে হল সারা,
জমি-জমা লিখে দিয়ে টাকা কর্জ করে!
নাজির পেয়াদা এনে
সুদ ও আসল গণে,
মহাজন নেয় সবই দুইদিন পরে!
ছেলে-মেয়ে-পরিবার
করে সবে হাহাকার,
ভাবিতে সে কথা মন হৃদয় বিদরে!

কে আর বুঝিবে হায় এ দেশের বাণী?
এ দেশের সবই গেছে,
কি আর এ দেশে আছে?
—ভিখারিনী হয়ে গেছে এ দেশের রানী।
কারে কব সেই কথা,
কে বোঝে সে মর্ম ব্যথা
যে কষ্ট সহিয়া আছি দিবস যামিনী।
কে আর বুঝিবে হায় এ দেশের বাণী?

কে আর বুঝিবে হায় এ দেশের বাণী ?
যে শোনে হৃদয় তার
জ্বলে হয় ছারখার,
কেন যে এমন হয় কিছুই না জানি !
পরাধীন দেশ হায়—
কেঁদে তার দিন যায়,
শোকে দুঃখে ভেঙে তার গেছে প্রাণখানি !
কে আর বুঝিবে হায় এ দেশের বাণী ?
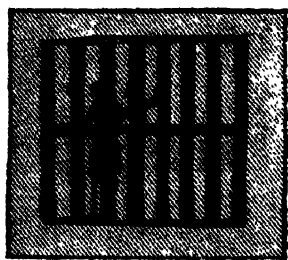
# কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

## স্বদেশের ধূলি

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
অনিল মলয় সদা বহমান।

নন্দন কাননে কিবা শোভা ছার,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার
ফল শস্য তার সুধার আধার
স্বর্ণ হতে সে যে মহা গরীয়ান্।

এ দেহ তোমার তারি মাটি হতে
হয়েছে সৃজিত, পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হবে অবসান।

পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত
এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত
ভাবীকালে তব ভবিষ্য-সন্তান॥

কংস-কারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ শৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান।

প্রকৃতির সন্তান জেনো সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে-করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন,
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান॥

## কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

### স্বদেশ-সঙ্গীত

মা গো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে
'বন্দে-মাতরম্' বলে ॥
যখন মুদব নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষজালে—
তখন সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

আমার মান-অপমান সবই সমান
দলুক না চরণতলে
যদি, সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হব কোন কালে!
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে!
ওদের বেত্রাঘাতে, কারাগারে
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

যে মা'র কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে
বল, লাঞ্ছনার ভয়, কার কোথা রয়
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

বিশারদ কয় বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে
সে তো অধম হয়ে সইতে রাজি
উত্তম চাও মুখ তুলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥
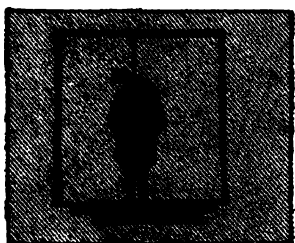
# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ভারতবিধাতা

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি' তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে.
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী—
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরি-ভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### ভারততীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী জপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হূন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি—
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তারি বিচিত্র সুর।

হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে—

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনতশিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।
সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এসো হে আর্য. এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমানভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### ভারতলক্ষ্মী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।
অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনকজননী-জননী।

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী।

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### দেশ দেশ নন্দিত করি…

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর' ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

বিঘ্ন বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল, টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবন ধনদীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

নূতন যুগসূর্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
গত গৌরব, হৃত-আসন, নত মস্তক লাজে—
গ্লানি তার মোচন কর' নরসমাজ মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

জনগণপথ তব জয়রথ চক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর' দান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ ভার হান' অশনিপাতে।
ছায়াভয়চকিতমূঢ় করহ পরিত্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন…

মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে
বর -পুত্রসঙ্ঘ বিরাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতির্দীক্ষা,
যাত্রীদল সব সাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
বল জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে॥

এস' বজ্রমহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস' হে, ধন্য কর' এ দেশ হে।
সকল যোগী, সকল ত্যাগী, এস' দুঃসহদুঃখভাগী—
এস' দুর্জয় শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।
এস' জ্ঞানী, এস' কর্মী, নাশ' ভারতলাজ হে।
এস' মঙ্গল, এস গৌরব,
এস' অক্ষয়পুণ্যসৌরভ,
এস' তেজঃসূর্য উজ্জ্বল-কীর্তি-অম্বর মাঝ হে
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে॥

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### সার্থক জনম

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥

কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক ··

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমার চরণ—
মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা॥
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি—
আমি জানি গো তার মূল্য জানি, পরের আদর কাড়ব না মা॥
মানের আশে দেশবিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে—
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারব না মা!
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ও মা, ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে, কারো কাছেই হারব না মা॥

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু···

এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ—
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা॥
অনির্বাণ ধর্ম-আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দিনে হে,
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে॥
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়—
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### আজি এ ভারত...

আজি এ ভারত লজ্জিত হে,
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা—
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে॥

ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বী 'পরে, ধূলিবিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে—
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে করো তারে সহসা তর্জিত হে॥
পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পলকে সজ্জিত হে॥
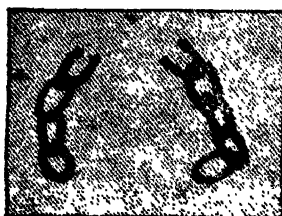
## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### ও আমার দেশের মাটি

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা॥
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা॥
ওমা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা—
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥
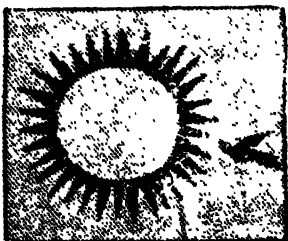
## বিজয়চন্দ্র মজুমদার

### উদ্বোধন

জাগো জাগো ভারতমাতা!
চরণতলে তব অভিনব উৎসব
করিব, রচিব নবগাথা।
অগণন-জনগণ-ধাত্রি!
অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা
অনন্ত সম্পদ-দাত্রি!
মঙ্গলবৃত তব কীর্তি;
তব গুণ গৌরব তব যশ সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী।
শূর-জননি সুর পূজ্যে!
নিহত সুকৃতি তব হৃত সুখ গৌরব
দনুজ-দলিত নব রাজ্যে।
নব্য জগৎ-ইতিহাসে
নগণ্য তুমি মা! অগণ্য মহিমা
বিস্মৃত দেশ-বিদেশে।
জাগো জাগো ভারতমাতা!
চরণতলে তব রোদন উৎসব
করিব, রচিব নবগাথা।

# স্বামী বিবেকানন্দ

## স্বদেশমন্ত্র

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা
এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—
এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?
এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা
স্বাধীনতা লাভ করিবে?

হে ভারত, ভুলিও না—
তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী;
ভুলিও না—
তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর;
ভুলিও না—
তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—
নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে,
ভুলিও না—
তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র;
ভুলিও না—
নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর
তোমার রক্ত, তোমার ভাই!

হে বীর সাহস অবলম্বন কর;
সদর্পে বল—
আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।

বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী,
ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই;
তুমি কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—
ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ,
ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর,
ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা,
আমার যৌবনের উপবন,
আমার বার্ধক্যের বারাণসী;
বল ভাই—
ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ,
ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ;
আর বল দিন-রাত,
'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে,
আমায় মনুষ্যত্ব দাও;
মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর,
আমায় মানুষ কর।'

# স্বামী বিবেকানন্দ

## নূতন ভারত বেরুক

নূতন ভারত বেরুক।
বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে,
জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে।
বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে।
বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।
বেরুক ঝোড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে।
এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—
তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা।
সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—
তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি।
এরা এক-মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে;
আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না;
এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন।
আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল,
যা ত্রৈলোক্যে নাই।
এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা,
এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা
এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !!

অতীতের কঙ্কালচয় !
এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।
ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—
ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও,
আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও,
কেবল কান খাড়া রেখো;
তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে
কোটি-জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী
ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি—
'ওয়াহ্‌ গুরু কি ফতে'।

# স্বামী বিবেকানন্দ

## ইহাই ভারতবর্ষ…

ভারতবর্ষ!
সত্যই এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা!
হয়ত সম্প্রতি-আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধ বানরের কঙ্কালটিও
এখানে পাওয়া যাইবে।
ডোলমেনদেরও অভাব নাই।
যে-কোন স্থান খুঁড়িলেই চকমকি পাথরের অস্ত্র মিলিবে।
গুহাবাসী ও পত্রসজ্জাকারী বনবাসী ও আদিম মৃগয়াজীবী,
এখনো নানা অঞ্চলে বিদ্যমান।
নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য,
তাতার, মঙ্গোল এবং পারসিক,
গ্রীক, ইয়ুংচি, হূন, চীন, সীথিয়ান,
ইহুদী, আরব এবং স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু,
তৎসহ জার্মান-বনচারী দস্যুদল—
এই সকল জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র,
যুদ্ধমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান,
নিরন্তর পরিবর্তনশীল,
ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত এবং নিম্নে পতিত হইয়া,
ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া,
আবার শান্ত হইতেছে—
ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী,
বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য
আমরা গর্বিত।

ভারতে সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্ত
আমরা গর্বিত।
ইহাদের পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষদের জন্ত
আমরা গর্বিত।
মানবজাতির আদিপুরুষ প্রস্তরের অস্ত্রব্যবহারকারীদের জন্ত
আমরা গর্বিত।
যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয় তবে জন্তুরূপী পূর্বপুরুষদের জন্ত
আমরা গর্বিত।
জড় অথবা চেতন—সমগ্র বিশ্বজগতের উত্তরপুরুষ হিসাবে
আমরা গর্বিত।

## স্বামী বিবেকানন্দ

### যদি ভারতবর্ষ···

ভারতবর্ষ যদি মরে যায়,
তা হলে পৃথিবী থেকে বিনাশ ঘটবে আধ্যাত্মিকতার;
লুপ্ত হয়ে যাবে
নৈতিক আদর্শের চরম প্রকাশগুলি;
নষ্ট হবে সকল ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ভাব;
মৃত্যু হবে ভাবুকতার।
তার স্থানে রাজত্ব করবে—
দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাস,
অর্থ হবে তার পুরোহিত,
প্রতারণা, পশুবল ও প্রতিযোগিতা
তার পূজার পদ্ধতি,
এবং বলির পশু—
মানবাত্মা।

# স্বামী বিবেকানন্দ

## পাগল হয়েছ কি…

হে স্বদেশহিতৈষিগণ!
তোমরা 'হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও।
তোমরা কি প্রাণে-প্রাণে অনুভব করেছ—
কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর
পশুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ?
অনুভব করেছ কি, কোটি কোটি মানুষ
যুগ-যুগ ধরে রয়েছে অনাহারে?
অজ্ঞানের কালো মেঘ
ভারতের আকাশকে করেছে আচ্ছন্ন?
সেই চিন্তা কি অস্থির করেছে তোমাদের,
কেড়ে নিয়েছে নয়নের নিদ্রা,
প্রবেশ করেছে রক্তের মধ্যে,
প্রবাহিত হয়েছে শিরায়,
মিশে গেছে হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে,
সে-ভাবনা কি পাগল করে তুলেছে তোমাদের?

# স্বামী বিবেকানন্দ

## হে পঞ্চনদের সন্তানগণ…

হে পঞ্চনদের সন্তানগণ…
আমি আপনাদের কাছে আচার্য হিসেবে উপস্থিত হইনি—
কারণ আপনাদের শেখানোর মতো জ্ঞান আমার খুব কমই আছে।
আমি এসেছি—দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে
পশ্চিমাঞ্চলের ভাইদের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করতে
এবং পরস্পরের ভাব মিলিয়ে নিতে।
আমি এখানে এসেছি—
আমাদের মধ্যে কী বিভিন্নতা আছে তা বের করার জন্য নয়;
আমি এসেছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তারই সন্ধানে।

কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করলে আমরা চিরকাল
সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারি,
কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে
যে-বাণী অনন্তকাল ধরে আমাদের আশার কথা শুনিয়ে এসেছে,
তা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে পারে,
তা বুঝবার চেষ্টা করতে আমি এখানে এসেছি।
আমি এখানে এসেছি—
আপনাদের কাছে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব করতে,
কিছু ভাঙবার পরামর্শ দিতে নয়।
…সমালোচনার দিন চলে গেছে,
আমরা এখন কিছু গড়বার জন্য অপেক্ষা করছি।…

আপনাদের বলতে চাই যে,
আমি কোন দল বা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নই।
আমার চোখে সব সম্প্রদায়ই মহান।
আমি সব সম্প্রদায়কেই ভালবাসি।
এবং সারা জীবন ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যা সত্য, যা উপাদেয়,
তাই খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে আসছি।...

## স্বামী বিবেকানন্দ

### দেশদ্রোহী

যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানের অন্ধকারে
ডুবে রয়েছে,
ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত
অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না,
এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।...
যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে,
ততদিন যে-সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার ক'রে
জাঁকজমক ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না,
আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।

# স্বামী বিবেকানন্দ

## যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হয় না

হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হয় না।
আজই হোক, কালই হোক, শত শত যুগ পরেই হোক,
সত্যের জয় হবেই, প্রেমের জয় হবেই।
তোমরা কি মানুষকে ভালবাস ?
ঈশ্বরের সন্ধানে কোথায় যাচ্ছ ?
দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সবাই কি তোমার ঈশ্বর নয় ?
আগে তাদের উপাসনা কর না কেন ?
গঙ্গাতীরে বাস করে কূপ খনন করছ কেন ?
প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর।
নাম যশের ফাঁকা চাকচিক্যে কী হবে ?
খবরের কাগজে কী বলে না-বলে,
আমি সেদিকে লক্ষ্য করি না।
তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে তো ?
তবেই তুমি সর্বশক্তিমান।
তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম তো ?
তা যদি হও, তবে তোমার শক্তি কে রোধ করতে পারে ?
চরিত্রবলে মানুষ সর্বত্রই জয়ী হয়।
ঈশ্বরই তাঁর সন্তানদের সমুদ্রগর্ভে রক্ষা করে থাকেন।
তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাইছে।—
তোমরা বীর হও।

# স্বামী বিবেকানন্দ

## হে ভারতের শ্রমজীবী

হে ভারতের শ্রমজীবী!
তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ
বাবিল, ইরান, আলেকজেন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস,
জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী,
দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য।
আর তুমি?— কে ভাবে এ কথা।...
তোমাদের পিতৃপুরুষ দু'খানা দর্শন লিখেছেন,
দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—
তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে
মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে?
লোকজয়ী ধর্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর,
সকলের পূজ্য;

কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না,
যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা,
অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা;
আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে
তাতে কি বীরত্ব নাই?

বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের—
বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়,
ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়;

কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা,
কর্তব্যপরায়ণতা দেখান,

তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী!
তোমাদের প্রণাম করি।

# স্বামী বিবেকানন্দ

## আমি তোমাদের কাছে

হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমার বন্ধুগণ, আমার সন্তানগণ,
আমাদের এই জাতীয় অর্ণবপোত বহু শতাব্দী যাবৎ
লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন-সমুদ্রের অপর পারে অমৃতধামে
বহন করে নিয়ে গেছে।...
আজ হয়তো তোমাদের নিজের দোষেই সেই জাহাজে দু-একটা
ছিদ্র হয়েছে,
সেই জাহাজ হয়তো একটু খারাপও হয়ে গেছে।
তাই বলে তোমরা কি এখন তার নিন্দা করবে?
জগতের সমস্ত জিনিসের চেয়েও যে-জিনিস আমাদের অধিক
কাজে এসেছে,
এখন কি তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত?
যদি এই জাতীয় জাহাজে—আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হয়ে থাকে,
তথাপি আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান।
আমাদেরই তো ঐ ছিদ্র বন্ধ করতে হবে।
এসো সানন্দে, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমরা এই কাজ সম্পন্ন করি।
আর যদি আমরা না পারি, এসো আমরা মরবার জন্য প্রস্তুত হই।
আমরা আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে ঐ ছিদ্র বন্ধ করবো;
কিন্তু কখনই এর নিন্দা করবো না।
এই সমাজের বিরুদ্ধে একটাও কর্কশ কথা বোলো না।
আমি একে ভালবাসি এর অতীত মহত্ত্বের জন্য।
আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি—
কারণ, তোমরা দেবতাদের বংশধর, মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের সন্তান।
কি করে আমি তোমাদের গালি দেবো, অভিশাপ দেবো?
না, কখনই না।
তোমাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক।

হে আমার সন্তানগণ, আমার সমগ্র পরিকল্পনাটি
আমি তোমাদের কাছে ব্যক্ত করতে এসেছি।
যদি তোমরা আমার কথা শোন,
আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।
যদি না শোন, এমন কি আমাকে যদি ভারতভূমি থেকে
পদাঘাত করে বের করে দাও,
তবুও আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসবো
ফিরে এসে বলবো: আমরা সকলে ডুবতে বসেছি।
সেইজন্যই আমি তোমাদের মধ্যে এসেছি।
আর যদি আমাদের ডুবতেই হয়, আমরা সকলে একসঙ্গেই যেন ডুবি।
কিন্তু কারও প্রতি কোন কটূক্তি কোন অভিশাপ যেন
আমাদের মুখ থেকে বর্ষিত না হয়।
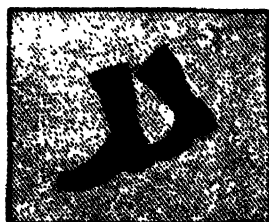
# দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

## জন্মভূমি

কি মাধুর্য জন্মভূমি জননি তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কত দিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।

লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে যে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন,
প্রতি তরুলতা মনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচোখে প্রিয় ছবি হেরি বার বার।

তোমা বিনা অন্য কারে মা ব'লে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে ;
অভূষণ শোভারাশি,
মাতঃ তব ভালবাসি ;
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্যময় স্বদেশ আমার।
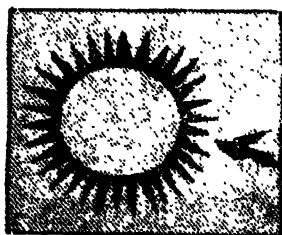
# দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

## ভারতবর্ষ

যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায়
প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, জয় মা জননি!
জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!

(কোরাস)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!
জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত!
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে
অমল-কমল আনন দীপ্ত,
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য
করিছে—তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

( কোরাস )—

ধন্য হইল ধরণী তোমার
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, জয় মা জগন্মোহিনি !
জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !”

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট,
সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—
পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত
তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে,
ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

( কোরাস )—

ধন্য হইল ধরণী তোমার
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, “জয় মা জগন্মোহিনি !
জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !”

উপরে পবন প্রবল স্বননে
শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়েছে পিক কলরবে,
চুম্বি' তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র,
করিয়া প্রলয়-সলিল বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন
কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !

(কোরাস)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার<br>
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;<br>
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!<br>
জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি,<br>
কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি;<br>
হস্তে তোমার বিতর অন্ন,<br>
চরণে তোমার বিতর মুক্তি;<br>
জননি! তোমার সন্তান তরে<br>
কত না বেদনা কত না হর্ষ;<br>
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি!<br>
জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!

(কোরাস)—

ধন্য হইল ধরণী তোমার<br>
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;<br>
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!<br>
জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"
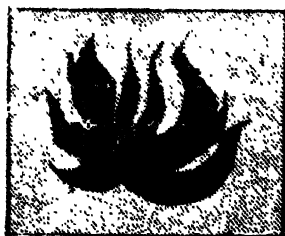
## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

### স্বদেশ-স্তোত্র

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়নরঞ্জন।
তোমারি হরিতক্ষেত্র আনন্দে ভাসাবে নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।

প্রভাতে অরুণছটা সায়াহ্ন অম্বরে,
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা-মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন।

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্তকরে শোভারাশি তাঁর?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জে উপবনে,
কোথা এত—কোথা এত বিমোহ নয়ন?
বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধ বরণ,
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।

হায় মা আসিয়ে যত নিষ্ঠুর যবন,*
হরিয়াছে ও দেহের সকল ভূষণ;
কিন্তু তব হিমগিরি, জাহ্নবীর নীল বারি,
পারিবে না পারিবে না করিতে লুণ্ঠন।

---

* ইংরেজ

অতুল স্বর্গীয় শোভা জননী তোমার,
মিশিবে না অশ্রু সনে নয়নে আমার ;
যেথায় যাইব আমি, তোমারে জনমভূমি
ভুলিব না ভুলিব না জীবনে কখন।

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

### ক'রো না, ক'রো না তার অপমান

আয়!
যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
করো না করো না তার অপমান!

আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী
যমুনা নর্মদা, সিন্ধু বেগবান ;
অই আরাবল্লী তুঙ্গ হিমগিরি ;—
করো না, করো না, তার অপমান।

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্তমান।
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?
করো না, করো না তার অপমান।

এ অমরাবতী, প্রতি পদে যার,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ;
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,
 করো না, করো না তার অপমান।

আজো বুদ্ধ-আত্মা, প্রতাপের ছায়া,—
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান !
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,—
 'করো না, করো না তার অপমান।'

## দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

### ভারত আমার

ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি
দর্শন ও উপনিষদে দীক্ষা,
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম্ম, ভক্তি, ধর্ম্ম, শিক্ষা।
( কোরাস্ )—
ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী,
কর্ম্মজ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্ম্মধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
ভগবদ্গীতা গায়িল স্বয়ং
ভগবান যেই জাতির সঙ্গে
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে,

সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র—
প্রচার করিল নীতির মর্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল সোঽহং ধর্ম।
(কোরাস্)—
ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি॥

আর্য ঋষির অনাদি গভীর
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি,
নহি কি আমরা তাদের গোত্র ?
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে,
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ—
যাদের গরিমাময় এ অতীত,
তারা কখনোই নহে মা তুচ্ছ।
(কোরাস্)—
ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি॥

ভারত আমার, ভারত আমার,
সকল মহিমা হোক খর্ব ;
দুঃখ কি, যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ;
যদি মা বিলয় পায় এ জগৎ
লুপ্ত হয় এ মানববংশ।
যাদের মহিমাময় এ অতীত,
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস !
(কোরাস্)—
ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি॥

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া

অতীতের সেই মহা-আদর্শ,

জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে

রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !

এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে,

আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,

এ মহাজাতির মাথার উপরে

করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।

( কোরাস্ )—

ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥
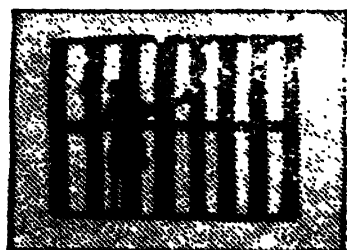
# দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

## সকল দেশের সেরা

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে !
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

# দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

## আয় ভারতসন্তান

আয় ভারতসন্তান হয়ে একপ্রাণ।
কত আর দুখে একা গাবি ভাই দুখগান।
একবার সবে মিলে,
জাতিভেদ যাও ভুলে,
এ হীন দশায় আর কেন জাতি-অভিমান।
নিরন্তর যার তরে,
ফেলিতেছে অশ্রুধারে,
হৃদে সে দারুণ চিন্তা হবে রে তোর নির্বাণ।
আয় ভারত-সন্তান হয়ে একপ্রাণ।

# কামিনী রায়

## তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা ;
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে,
তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা।

এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী-যমুনার তীরে,
পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্মদা, কাবেরী,
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।

আর দেখিনু শতেক ভারতসন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান,
আসিছে যেন গো তেজে মূর্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা

ঘরে ভারত রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি .
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা
গাইছে উল্লাসে বিজয়-গাথা।

# কামিনী রায়

## মাতৃপূজা

যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী-ভূমি,—মা আমার, মা আমার!

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার!

অতীতের কথা কহি' বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমার তরে,—মা আমার, মা আমার!

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ, মা আমার, মা আমার!
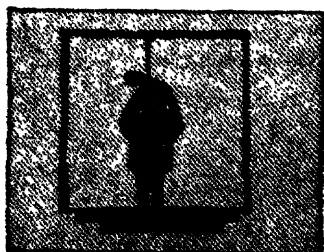
## রজনীকান্ত সেন

### জয় জয় জনমভূমি

[ মিশ্র পরোজ : কাওয়ালী ]

জয় জয় জনমভূমি, জননি !
যাঁর স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী ;
কীর্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী !

উজ্জ্বল-কানন-হীরক-মুক্তা
মণিময় হার-বিভূষণ-যুক্তা ;
শ্যামল-শস্য পুষ্প-ফল পূরিত,
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি !

সর্ব শৈল-ধৃত, হিমগিরি-শৃঙ্গে,
মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে,
সাহস-বিক্রম-বীর্য-বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞান-খনি !

জননী-তুল্য তব কে মর জগতে ?
কোটী কণ্ঠে কহ, "জয় মা ! বরদে !"
দীন বক্ষ হ'তে, তপ্ত রক্ত তুলি'
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি !
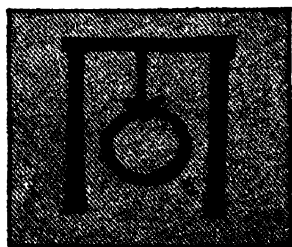
# রজনীকান্ত সেন

## মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

[ মূলতান : খড়খেমটা ]

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।

ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
খাবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।

আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই ;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

## চিত্তরঞ্জন দাশ

### পূজার সঙ্গীতে তব

আজিকে সঙ্গীত তব কোথা ভেসে যায়?
ধূসর তরঙ্গ মাঝে নীরব সন্ধ্যায়!
কোন্ দূরে অন্ধকারে কোথা উঠে বাজি?
আমার পরাণ লয়ে কি করিছে আজি!
আরতির শঙ্খ যেন উঠিল বাজিয়া
তোমার পূজার লাগি ধূপ ধুনা দিয়া
পুণ্য ধূমে সুপবিত্র হৃদয়-মন্দির!—
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর!
হে পূজারি! আজি তুমি কোন্ পূজা কর?
পরাণ প্রদীপ মোর ঊর্দ্ধে তুলি ধর,
কার পানে, কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ?
কোন্ পূজা লাগি বল এত আয়োজন?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু? মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভ'রে!

## অতুলপ্রসাদ সেন

### ভারতলক্ষ্মী

উঠ গো, ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগৎ-জন-পূজ্যা!
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল কনক ধন-ধান্যে!
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলে কক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।
কাণ্ডারী! নাহিক কমলা, দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন দর্শে,
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণ-তলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ কুঞ্জে
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে॥
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণ-তলে ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো॥
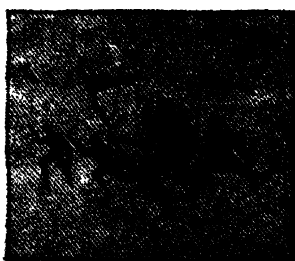
# অতুলপ্রসাদ সেন

## বল, বল, বল সবে

বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান্ হবে, কর্ম্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে!
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা, বন,
প্রতি জন-পদ তীর্থ অগণন কহিছে গৌরব-কাহিনী।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী,
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ—আমরা তাঁদেরই সন্ততি॥

ভোলেনি ভারত ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক, নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ, এক জাতি প্রেম-বন্ধনে॥

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মে নি মিছে
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য, আসিবে আবার আসিবে॥

এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী
এস হে অনার্য গিরি-বন-বাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,—মিল হে মায়ের চরণে।
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,—মিল হে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান্—মিল হে মায়ের চরণে॥

## অতুলপ্রসাদ সেন

### হও ধরমেতে ধীর

হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয়।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্;
দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান—জগজন মানিবে বিস্ময়!

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন!
ভারত-গগনে পুনঃ আসিবে সুদিন—ঐ দেখ প্রভাত-উদয়!
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থ ডরে—সত্যের নাহি পরাজয়॥

## সরলা দেবী চৌধুরাণী

### ভারত-জননী

বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি
বর-পুত্রের তপ-অর্জিত গৌরব-মণি মালিনি।
কোটি-সন্তান-আঁখি-তর্পণ-হৃদি-আনন্দ-কারিণি—
মরি বিদ্যা মুকুট-ধারিণি!
যুগ-যুগান্ত তিমির-অন্তে হাস মা কমল-বরণি!
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী।
নব জীবনের পশরা বহিয়া
আসিছে কালের তরণী, হাস মা কমল-বরণি!
এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি
শৌর্য-বীর্যশালিনি!
আবার তোমায় দেখিব জননি
সুখে দশদিক্-পালিনী।
অপমান ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
খর্পর-করবালিনি। শৌর্য বীর্যশালিনি।

## সরলা দেবী চৌধুরাণী

### নমো হিন্দুস্থান

অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ পূরিত সেই নামগান!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে 'নমো হিন্দুস্থান!'
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
'নমো হিন্দুস্থান!'

ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মিলাও দুঃখে, সখ্যে সাম্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে 'নমো হিন্দুস্থান!'
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
'নমো হিন্দুস্থান!'

সকল-জন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম-নিশান! ধর্ম-বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে 'নমো হিন্দুস্থান!'
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—
'নমো হিন্দুস্থান!'

[ ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা-কংগ্রেসে গীত ]

# করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

## মঙ্গল-গীতি

যেই ভারতের মহাভূমিতলে যজ্ঞের হুতাশন,
পরমোজ্জ্বল স্বর্ণ-শিখায় প্রভাসিল তপোবন ;
মূরতি ধরিয়া অমৃতমন্ত্র পুণ্য-হবির গন্ধে
প্রতিধ্বনিল ঋষির কণ্ঠে সাম-গায়ত্রী ছন্দে ;
ওঁঙ্কার বীজ জনম লভিল যেখানে বর্ণমালা ;
নিবেদিত যেথা বাগ্‌দেবী-পদে পূজার পদ্ম-ডালা ;
বাল্মীকি-ব্যাস রচিল রুচিরা কবিতা-কল্পলতা,
বেদ-বেদান্ত, ব্রহ্মবিদ্যা-গীতা-ভাগবত-কথা ;
গণিত যেখানে ধায় অনন্তে, অভয়ের পদ বন্দে ;
সত্য যেখানে নিত্য শোভায় মিশে সচ্চিদানন্দে ;
সেই ভারতের বেদী-মণ্ডপে ভস্মের টিকা পরি'
দাঁড়াইনু আজি মঙ্গল-গীতি-মন্ত্রে কণ্ঠ ভরি।

ভূধর কহিছে যাঁহার মহিমা মরুতের কানে কানে,
ঝঙ্কার ওঠে নীল জলধিতে উতরোল কলতানে।
যিনি বরেণ্য, বরদ, পুণ্য, জয়-মঙ্গল-দাতা,
লীলা যাঁর এই দ্যুলোকে-ভূলোকে, যিনি পিতা, যিনি মাতা।
জ্যোতিরূপ যাঁর মণি-কাঞ্চনে রস-রূপ তরুতৃণে,
পরিমলরূপ প্রসূনে প্রসূনে, ধ্বনিরূপ চিদ্‌বীণে ;
জীবনে যাঁহার আনন্দরূপ, মন বুদ্ধি ও জ্ঞানে,
শুক সনকাদি নিমগন যাঁর ঐশ্বর্যেরই ধ্যানে ;
নীল-উৎপল-দল-ভাতি-রূপ পরকাশে চরাচরে,

কুরুক্ষেত্রে, গয়া, গঙ্গায়, বারাণসী, পুষ্করে।
শাশ্বত যাঁর করুণা-উৎসে রচিত বিশ্ব-ব্যোম,
তারকা-ভূষণ রাশির চক্রে বিহরে সূর্য, সোম।
যিনি অক্ষয়, অবারিত যাঁর প্রেম-ভাণ্ডার-দ্বার,
তাঁহারি কর্মে তাঁরে সঁপিলাম, ফলে নাহি অধিকার।

## যতীন্দ্রমোহন বাগচী

### মায়ের তরে

[ বাউল ]

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দে না !
ওরে, মায়ের তরে প্রাণটি দিবার,
এমন সুযোগ আর হবে না।
যখন দু'দিন আগে, দু'দিন পরে,
তফাৎ মাত্র এই ;—
তখন অমূল্য এই মানব-জনম
বৃথা দিতে নেই,—
ওরে ক্ষ্যাপা !
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
দে রে মায়ের তরে ;
অমর জীবন পাবি রে ভাই !
জগৎ-মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্, লিখবে যখন
পরকালের খাতা,—
( তখন ) তোরই দানে হবে আলো
বইয়ের প্রথম পাতা,—
ওরে ক্ষ্যাপা !

## মুকুন্দ দাস

### ভারতের ভগ্নপ্রাণগুলি

ভারতের ভগ্নপ্রাণগুলি লগ্ন করে দে মা,
মগ্ন হউক তব চিন্ময়ী রূপ ধ্যানে।
গণ্ডী ভেঙে ফেলে মুক্ত গগন তলে,
দাঁড়াক মিলনপ্রার্থী চূর্ণ করি অভিমানে॥
তোমারই সৃজিত বিশ্ব তোমারই তো সৃষ্ট ফুল,
তোমার বিরুদ্ধে আজ বিদ্রোহ ঘোষণা।
ভুল ভেঙে দেও মা গো আনন্দে নৃত্য করি,
ছুটুক পরাণ গঙ্গা মুক্তি সাগর পানে॥
তরুণ ভারতে আজ হতেছে যে অভিনয়,
কে জানে কোথায় হবে এ নাটকের অঙ্ক শেষ।
যবনিকার অন্তরালে জানি না কোন্ চিত্র আঁকা,
ধ্বংসের ভৈরব গর্জন মুহুর্মুহু শুনি কানে।
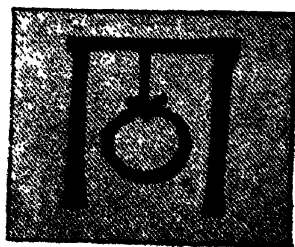
## মুকুন্দ দাস

### এসেছে ভারতে নবজাগরণ

এসেছে ভারতে নব জাগরণ,
পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ
মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা
জগতে শিক্ষা করিতে দান ॥
স্তম্ভিত করি বিশ্বমানবে
শিষ্য করিতে জগৎখান—
কহিছে সে আজ পুণ্য বারতা
শোন রে সকলে পাতিয়া কান।
বিরাট ব্যোম্ ছত্র তলে
রবি শশী ঐ তাঁরই আঁখি জ্বলে—
ইঙ্গিতে তার ত্রিভুবন টলে
এ মরজগতে তিনি গরীয়ান্।
অমৃত তিনি শাশ্বত তিনি
তাঁরেই অর্ঘ্য কর হে দান।
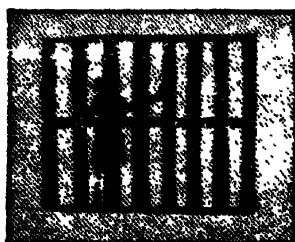
# মুকুন্দ দাস

## বন্দে মাতরম্ ব'লে নাচ রে সকলে

বন্দে মাতরম্ ব'লে নাচ রে সকলে,
কৃপাণ লইয়া হাতে।
দেখুক বিদেশী হাস্থক অট্টহাসি,
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে॥
বাজাও দামামা কাড়া ঘন্টা ঢোল,
শঙ্খ করতাল জয়ডঙ্কা খোল;
নাচুক ধমনি শুনিয়ে সে রোল,
হউক নূতন খেলা শুরু এ ভারতে॥
এখনো কি তোদের আছে ঘুমঘোর,
গেছে কুল মান, মোছ্ আঁখি লোর।
হও আগুয়ান ভয় কি রে তোর—
বিজয় পতাকা তুলে নিয়ে হাতে॥
কবে যে ভারতে আসিবে সেদিন,
ভেবে তা মুকুন্দ দিন দিন ক্ষীণ।
আজ কাল বলে কেটে গেল দিন,
দিন পেলে লীন হতেম চরণেতে॥
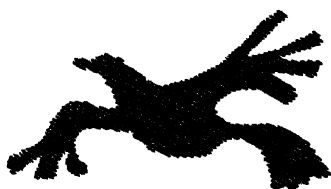
# কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

## শাসন-সংযত কণ্ঠ

শাসন-সংযত কণ্ঠ জননি ! গাহিতে পারি না গান !
( তাই ) মরম-বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ ।
সহি প্রতিদিন কোটী অত্যাচার
কোটী পদাঘাত কোটী অবিচার,
তবু হাসি মুখে বলি বার বার,—
'সুখী কেবা আর মোদের সমান ?'
বিনা অপরাধে অন্নহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর
তবু আশে পাশে শত গুপ্তচর,
প্রতি পলে লয় মোদের সন্ধান ।
শোষণে শূন্য কমলা-ভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার,
যে বলে একথা, অপরাধ তার,
হায় হায় এ কি কঠোর বিধান !
না জানি জননি ! কত দিন আর
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ ?

## কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

### অবনত ভারত চাহে তোমারে

অবনত ভারত চাহে তোমারে
এস সুদর্শনধারী মুরারী।
নবীন তন্ত্রে নবীন মন্ত্রে
কর দীক্ষিত ভারত নর-নারী।

মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ নিনাদে,
বিচূর্ণ কর সব ভেদ-বিবাদে,
সম্মান-শৌর্যে, পৌরুষ-বীর্যে,
কর পূরিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।

মুক্ত সমুন্নত-পতাকা তলে,
মিলাও ভারত সন্তান সকলে,
নব আশে হিন্দুস্থান, ধরুক নূতন তান,
এস অরি-শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে
নব বেশে ভীষণ অসিধারী।
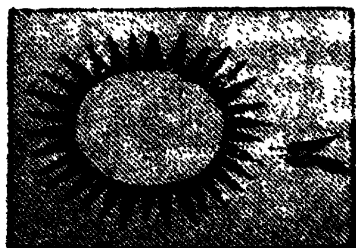
# সরোজিনী দেবী

## মা তোমারি তরে

মা তোমারি তরে এসেছি এ ঘরে
পতিত সন্তান রাখ চরণে
আমরা দুর্বল বিদেশী প্রবল
আশিসে সবল কর এ সন্তানে।

এ হৃদয় বীণা ধরিবে মা তান,
গাহিবে তোমারি জয় গুণগান,
ভারতবর্ষে যত হিন্দু-মুসলমান,
মাতিয়া উঠিবে সে-গভীর তানে।

আমরা অক্ষম কলঙ্ক মলিন
জেগেছে জাপান, জাগিয়াছে চীন,
নিজ দোষে আছি হয়ে দীনহীন,
অবশ অলস না দেখি নয়নে।

অ্যামেরিকা-আদি আর অস্ট্রেলিয়া,
আরো কত দেশ উঠিল জাগিয়া,
আমরাই শুধু অলসে ঘুমিয়া
সুখের শয্যায় এখনো শয়নে।

ভারতজননী মাতা গরীয়সী
পরের অধীনে কাঁদিছেন বসি
মায়ে প্রবোধিয়ে ধর ত্যাগ-অসি
মাতৃ-আশীর্বাদ ধার্য করি মনে।

## সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

### সন্ধিক্ষণ

এতদিনে। এতদিনে বুঝেছে বাঙালী
দেহে তার আজো আছে প্রাণ
এ জগতে যোগ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আমরাও ক'রে নেব স্থান।
যে খুশী টিট্‌কারী দিক
অন্তরে বুঝেছি ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ!

পথেঘাটে দেখ চেয়ে অন্দরে বাহিরে
দেশহিতে বিলাস বর্জন,
বিরাট সহস্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয়া
লক্ষ মুখে এক দৃঢ় পণ।
যেথা যে বাঙালী আছে
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে,
শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙালী,
মনে হয় আর মোরা রব না কাঙালী।

এ বড় আশার দিন—পণ্য স্বদেশের
সবে তুলে লয়েছে মাথায় ;
এবার পরীক্ষা হবে প্রতিজ্ঞার বল,
ভগবান্ হউক সহায়।

ভুলেছিনু মনুষ্যত্ব
বিলাস-ব্যসনে মত্ত,
ভুলেছিনু পৌরুষের স্বাদ,—
কে জাগালে সে পৌরুষ ?—সিংহের আহ্লাদ ?

এ বড় সঙ্কটকাল—পণের রক্ষণ,—
আমাদের ভ্রম পদে পদে,
সতর্ক জাগ্রত যেন রহি সর্বক্ষণ,
নাহি ডুবি কলঙ্কের হ্রদে।
স্মরি স্বদেশের দুখ—
মাতা-পত্নী-কন্যা-মুখ—
নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ—
"বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবন।"

দরিদ্র দেশের কোলে দরিদ্রের বেশে
আমাদের সাজিবে সুন্দর,
'খাটো দেহে খাটো ধুতি'—লজ্জা কিবা তায় ?
শ্রমের সৌন্দর্য মহত্তর!
শক্তিমান দেহমন
ভীষ্মের মতন পণ,
তার চেয়ে কি আছে শোভন ?
জুড়ায় পরাণ মন, কি ছার নয়ন ?

ভগবান্ হীনবলে তুমিই দিয়েছ
এ অপূর্ব নূতন জীবন!
লইয়া অভয় নাম প্রতিজ্ঞা করেছি ;
শক্তি দাও রাখিব সে পণ।

নব স্রোত বঙ্গভূমে,
তোমার নির্দেশে নেমে,
সর্বপ্রাণ করেছে সজীব ;
হে বরদ ! শুভঙ্কর ! হে সুন্দর ! শিব

তুমি দাও বুঝাইয়া নিন্দুকে, কুটিলে,—
'বাঙালীও জন্মেছে মানব,
কা'র চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙালীর দাবি
বৃথা সে করে না কলরব ;
মঙ্গল-বিধান যত,
স্বদেশের সেবা-ব্রত,
আজ সে মাথায় নেবে তুলে ;
মূঢ় সে—যে দাঁড়াইবে তার প্রতিকূলে !'

উন্মুক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে
মনুষ্যত্ব-মহত্ত্বের পথ,—
চিরধন্ত সে পথে কণ্টক দিতে পারে,—
এমন জন্মে না দাসখত ;
চুক্তির বেতন পাও,—
সর্ত মত কাজ দাও ;
যে প্রভু অধিক করে আশ
বল তারে—'কর্মচারী নহে ক্রীতদাস ।'

'অর্থের সম্বন্ধ হতে কত উচ্চতর
মনুষ্যত্ব · দেশহিত-ব্রত ;
স্বার্থ সাথে স্বদেশের বিরোধ যেথায়
স্বদেশেরি পায়ে হব নত ।'

একথা না ভুলে রই—
'আমি শুধু তুমি নই—
দশের মাঝারে একজন ;
দেশের-দশের শুভে কল্যাণ আপন।'

এমনো পণ্ডিত-মূর্খ জন্মেছে এ দেশে,—
শুনিবারে সাহেবের মুখে
নিজের বুদ্ধির কথা ; স্বদেশে বিদেশে
'পণ পণ্ড' বলে স্ফীত বুকে ;
নিজ মুখে মাখি কালি,
লভে শূন্যে করতালি,—
কালি দিয়া দেশের গৌরবে।
হা বঙ্গ! দিয়েছ স্তন্য ইহাদেরো সবে!

শুনি পণপত্রে কত রাজভৃত্য, হায়,
সহি করে অস্পষ্ট অক্ষরে!
কি লজ্জা! এতই ভয় চাকুরির তরে?
কি লভিবে দাস্যবৃত্তি ক'রে?
বাণিজ্যে বসেন রমা
কৃষি প্রায় তারি সমা,
দুই পন্থা উন্মুক্ত তোমার।
তবু দ্বিধা-কৃত মন? জঘন্য আচার!

স্বার্থান্ধ স্বদেশদ্রোহী জান নাকি হায়—
জান নাকি আত্মদ্রোহী তুমি ;
পুত্র-পৌত্র অন্নাভাবে মরিবে ; এখনো
প্রসারিয়া লও কর্মভূমি।

কারে কর পরিহাস ?
নিজ স্ত্রীর লজ্জাবাস—
তাও নহে আয়ত্ত-অধীন !
সত্য তুমি অতি দীন—অতি দীনহীন ।

আজি যারা অনাগত—ভবিষ্য যাদের
কি মান তাদের কাছে পাবে ?
কোন্ স্বত্ব কোন্ বিত্ত—স্ববৃত্তি ব্যতীত—
তাহাদের তরে রেখে যাবে ?
কোন কর্ম, কোন্ রীতি,
কোন্ মহত্ত্বের স্মৃতি,—
তাহাদের হবে মূলধন ?
স্মরিয়া তাদের কথা—দৃঢ় কর পণ ।

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বর্জন,
চমৎকার ! দৃশ্য চমৎকার !
বিলাস-বর্জনে হের তরুণী ছাত্রীরা
অগ্রগামী আজি সবাকার ।
বল' রাজপুতানারে—
বেণী বিসর্জিতে পারে
বঙ্গনারী তাঁদেরি মতন,
অন্তরে সে বীরাঙ্গনা, শৌর্যে ভরা মন ।

শিক্ষক শিখান্ আজি বালকে যুবকে
হইবারে দেশের সেবক ;
যত ধনী মহাজন পণ-বদ্ধ সবে,
ঊর্দ্ধ-শিখা উৎসাহ-পাবক !

মহাপ্রাণ, সমুদার
কত শ্লাঘ্য জমিদার
লয়েছেন দেশহিত-ব্রত
মুক্তকোষ সবে, প্রাচ্য রাজাদেরি মত।

আর আজি ধন্য তুমি দরিদ্র বাঙালী,—
দিয়েছ সংশয় বিসর্জন
যেন মন্ত্রবলে তুমি মুক্তহস্ত এবে,
কোথা পেলে এব বড় মন!
পরস্পরে এ প্রত্যয়—
যত্নে আসিবার নয়:
এ রত্ন দেছেন ভগবান!
অন্তরে সঞ্চিত করি রাখ দৈবদান।

বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার
কূল প্লাবি' আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই; সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার!
সে জোয়ার এসেছে রে
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে রে নূতন জীবন!
বাঙালী পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন

কণা কণা স্বর্ণ ছিল মৃত্তিকার মাঝে,
ধূলিপারা ধূলি মাঝে হারা;
আজি কোন্ অনির্দিষ্ট ভূগর্ভের তাপে
গলে মিশে হল স্বর্ণধারা।

হার গড়ি সে কাঞ্চনে,
এস সবে, সযতনে—
পরাইব দেশের গলায় ;
জননি ! জনমভূমি ! সাজাব তোমায় ।

বাহিরের ঝড় এসে ভাঙে যদি ঘর—
কোথা থাকে পুত্র-পরিবার ?
অন্তরে প্রবল হাওয়া উঠিয়াছে যদি
নত হও সম্মুখে তাহার ।
স্বদেশ, তোমার পানে—
দেখ গো উদ্বিগ্ন প্রাণে
কাতর নয়নে চেয়ে আছে ।
আশা করে মাতৃভূমি প্রত্যেকেরি কাছে ।

পবিত্র কর্ত্তব্য-ব্রত লয়েছি মস্তকে,
মরেও রাখিতে হবে পণ !
রাজ্যপণে পাশা খেলি' পণরক্ষা হেতু
বনে গেছে হিন্দু রাজগণ !
বিদেশের মুখ চেয়ে,
শতেক লাঞ্ছনা সয়ে,
সংজ্ঞা যদি এসেছে আবার,—
প্রতিজ্ঞা স্মরিয়া, শীঘ্র লও কার্যভার ।

এদিন অলসে গেলে, কি ক্ষতি যে হবে—
দেখ বুঝে অন্তরে সে কথা ;—
আশাভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি-অপচয়,
শতদিকে পাবে শত ব্যথা ;—
শত্রু সে পাড়িবে গালি,
দু'গালে পড়িবে কালি,—

আমল পাবে না কারো ঠাঁয়ে,
আবার সহস্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে।

জাতিত্ব-গৌরব যাবে অঙ্কুরে মরিয়া,
ঝরিবে রে আধফোটা ফুল
ভগবান! রক্ষা কর—শক্তি কর দান,
প্রভু মোরা হয়েছি ব্যাকুল!
দুর্বলের বল তুমি!
দীনের শরণ-তুমি!
আশ্রয় লইনু তব পায়,
লজ্জা-নিবারণ সখা! হও হে সহায়!

কে আছ হে ধনবান আন স্বর্ণ-ধন,
কায়ক্লেশে আন শ্রমী যেবা,
শিল্পী আন নিপুণতা, উদ্যোগী উদ্যম,
সবে মিলি কর মাতৃ-সেবা।
পরিশ্রমে নাহি লাজ—
আপনি চাষীর কাজ—
করিতেন রাজা মিথিলায়!
মন্ত্রদ্রষ্টা স্রষ্টা ঋষি আদি সূত্রধর!

সুবেশ রাখাল-বেশ সকলি ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি ভর—
কর্মে হও অগ্রসর!
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুগ';
বঙ্গ-ইতিহাসে হের এল স্বর্ণ-যুগ!

## কুমুদরঞ্জন মল্লিক

### ভারত-মহিমা

ধন্য আমরা পুণ্য বিশাল ভারতের সন্তান,
শত দৈন্যেরও মাঝে মানি মোরা পরম ভাগ্যবান।
ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তির লাগি মোরা করি তর্পণ,
করি যে সর্ব কর্মের ফল নারায়ণে অর্পণ।
মধু রাত্রিন্দিব—
গোটা ভারতের আরতি করিয়া জ্বালি মোরা গৃহদীপ।

অপবিত্র তো হবে না এ মাটি শুদ্ধ ও সিদ্ধ,
ভক্তের পদ-পরশে নিত্য সে অপাপবিদ্ধ!
এখানে বৃথাই অপশক্তির দম্ভ-সৌধ গাঁথা,
চূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশিবে বাসুকি নাড়িলে মাথা।
নাহি কোনো ভয় নাহি,
জ্বালামুখী শিখা সর্বারিষ্ট-সর্বদর্প-দাহী।

মন্দির ভাঙি উপলখণ্ড যাহারা গিয়াছে লয়ে,
সে-দেশ সে-জাতি রহিবে না পর, যাবে আপনার হয়ে।
শ্রদ্ধা তাহার থাক্ বা না থাক্, না থাকুক নিষ্ঠা,
অজ্ঞাতে তারা করেছে সেখানে শিবের প্রতিষ্ঠা।
অনেক কষ্ট সহি
বৃথাই তাহারা পাষাণের ভার লয়ে যায় নাই বহি।

ভারতের ধনরত্ন লইয়া যাহারা করিছে ফেরি,
ক্ষতি কিছু নাই, বিনিময়ে তারা হয়ে গেছে আমাদেরি।
সপ্ত-নদীর বন্যার জল প্রবেশ যেখানে লভে,
এই ভারতের ভাণ্ডার চির-প্রসারিত সেথা হবে।
ওই বাজে জয়ভেরী—
হরণ করেছে, বরণ করিতে করিবে না বেশী দেরী।

আনন্দ মোর কতই নিবিড়, কি বিপুল হর্ষ!
আমি ও আমার প্রতি অণুটুকু এ ভারতবর্ষ।
আমি গয়াকাশী, আমি অযোধ্যা, পুরী ও বৃন্দাবন,
আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্মীর, সোমনাথপত্তন।
আমি তো ক্ষুদ্র অতি,
কিন্তু বিরাট ওই হিমাদ্রি আমার গোত্রপতি।

ভারত-তনয় অমৃত-পুত্র আমি মৃত্যুঞ্জয়,
পুণ্যবাহিনী গঙ্গা আমাকে আদরে অঙ্কে লয়।
হোক ইউরোপ, হোক আফ্রিকা, হোক না সে আমেরিকা,
আমার চিতার অগ্নি যেখানে সেখানেই হোমশিখা।
যেখানে রবে সে ছাই,
চিরদিন তরে ভারতবর্ষ হয়ে যাবে সেই ঠাঁই॥
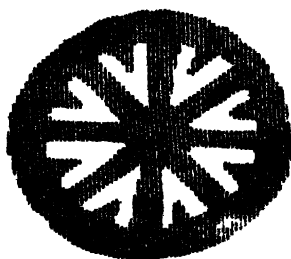
# কুমুদরঞ্জন মল্লিক

## আমাদের ভারত

অভ্রভেদী তুষার কিরীট বিশাল হিমালয় ;
আপন করা তাকে বড় সহজ কথা নয় ।
দুর্নিরীক্ষ্য অদ্রি বিরাট, নাগাল পাওয়া ভার ;
অন্ত না পাই তাহার রূপের, তাহার মহিমার ।
আমরা তো সেই হিমগিরির হেরি রাজশ্রী—
পার্বতী যার কন্যা এবং মেনকা যার স্ত্রী ।

সিংহ নরসিংহ তাহার মূর্তি ভয়াল অতি ।
ভালবাসি আমরা তাহার থাবার গজমোতি ।
সাপের মাথার মানিক খুঁজি, দৃষ্টি মোদের তথা ;
তুচ্ছ করি বিষের দশন, বক্র ভীষণতা ।
হাঙর-তিমির লবণজলের সাগরে নাই সখ,
মুক্তা যে দেয় সেই সাগরের আমরা উপাসক ।

এই ভারতে করেনি ভাগ মোগল কি ইংরাজ ;
একদিকে তার কামাখ্যা, আর একদিকে হিংলাজ ।
নিজের জাতির কৃষ্টি রেখে গেছে উৎপীড়ক,—
নিভেছে আগ্নেয়গিরি উদগারি হীরক ।
শ্যামের ভারত শ্যামার ভারত অসি-বাঁশীর দেশ ;
মধুময় তার চরণরজ, মধুর পরিবেশ ।

ভরা কোটি জ্যোতিষ্কেতে মহান্ নীলাকাশ,
মোদের আকাশ সেই যেখানে ধ্রুবতারার বাস।
মোদের আকাশ স্বচ্ছ সুনীল দিব্য নীলাম্বর,
রাকা চাঁদের সুধার সায়র, রামধনুকের ঘর।
কোথায় মোদের ক্ষুদ্র অণু, কোথায় মহাকাশ!
আমরা ঘটে-পটেই দেখি তাহার যে বিকাশ।

মোদের শ্যামা চামুণ্ডা ন'ন, তিনি তো ন'ন ভীমা,
অন্নপূর্ণা তিনি যে, তাঁর স্নেহের নাহি সীমা।
করেন নাকো কেবল তিনি দৈত্য-দলনই,
'কমলে-কামিনী' তিনি গণেশজননী।
দশ হাতে দশ প্রহরণের রাখবো খবর কি,
আমরা দেখি কেবল মায়ের হাতের ঝিনুকই।

ন'ন তো মহাদণ্ডধারী মোদের ভগবান,
অজ্ঞেয় অগম্য তিনি শুনেই কাঁপে প্রাণ।
আমরা করি ভক্তিভরে তাঁহার আরতি,
ন'ন তো তিনি কংসারি কি পার্থ-সারথি।
মোদের ঠাকুর দয়াল ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর তিনি—
বাঁশী বাজান, পায়ে বাজে নূপুর রিনিঝিনি॥

## যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

### দেশোদ্ধার

বার বার তিনবার,
এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার।
শোন্ রে শ্রমিক, শোন্ ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালোবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।

তোদের দুঃখে হায়,—
পাষাণ হলেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
ক'রো নাকো ভাই হীন আশঙ্কা
এবার নয়নে ঘষিনি লঙ্কা ;
সত্য সত্য ত্রিসত্য করি, হৃদয় তোদেরই চায়।

ওরে চির পরাধীন !
তোরা না জানিস্ মোরা জানি তোর কী কষ্টে কাটে দিন।
নানা পুঁথি পড়ে পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তের-আনা প্রাণ ;
বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন !

তোরাই যে ভাই দেশ,
তোদের দৈন্য-জন্য মায়ের কঙ্কাল অবশেষ।
মহার্ঘ হলে বেগুন পালঙ্
যদিও ভিতরে চটে হই টং
তবু তোর সেবা দেশেরই যে সেবা মনে মনে বুঝি বেশ।

ওরে নাবালক চাষা!
আমরা তোদের ভাঙাব নিদ্রা মূক মুখে দিব ভাষা।
শ্রমিক চাষীর দুখের ফর্দ
রচিতে ছুটিব লিলুয়া খড়্‌দ।
গড়িয়া আইন ভাঙি' রে-আইন জাগাইব নব আশা!

ওরে ওঠ্ ওঠ্ জেগে,—
তরুণ অরুণ আলোকে জানাও অজানা ব্যথায় লেগে!
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল,
পাঁচনে খেদায়ে বলদের দল,
প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বেঁধে চল্ বেগে।

জুড়ে দে লাঙল ক'ষে ;—
ক্ষালের আগায় যত উঁচুনীচু সমভূম কর চ'ষে।
মাথা উঁচু করে আছে ঢ্যালাগুলো,
মই-এর চাপনে করে দে রে ধুলো ;
কাঁটার বংশ কর্ রে ধ্বংস জোএ জোএ বিদে ঘষে।

ফসল হবেই হবে!
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল ফুঁড়িবি তবে।
আপনার হাতে বুনেছিস্ যাকে
টেনে তুলে বলে রুয়ে দিবি পাঁকে ;
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।

সেই দুর্যোগ উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার,—
সরে পড়ি যদি ক্ষমা করো দাদা!
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা?
মনে করো ভাই মোরা চাষা নই—চাষার ব্যারিস্টার!

# সুকুমার রায়

## অতীতের ছবি

॥ ১ ॥

ছিল এ-ভারতে এমন দিন
মানুষের মন ছিল স্বাধীন :
সহজ উদার সরল প্রাণে
বিস্ময়ে চাহিত জগৎ পানে ।
আকাশে তপন তারকা চলে,
নদী যায় ভেসে, সাগর টলে,
বাতাস ছুটিছে আপন কাজে,
পৃথিবী সাজিছে নানান্ সাজে :
ফুলে ফলে ছয় ঋতুর খেলা,
কত রূপ কত রঙের মেলা :
মুখরিত বন পাখির গানে,
অটল পাহাড় মগন ধ্যানে ;
নীলাকাশে ঘন মেঘের ঘটা,
তাহে ইন্দ্রধনু বিজলী ছটা,
তাহে বারিধারা পড়িছে ঝরি—
দেখিত মানুষ নয়ন ভরি ।
কোথায় চলেছে কিসের টানে
কোথা হতে আসে, কেহ না জানে ।
ভাবিত মানব দিবস-যামী,
ইহারি মাঝারে জাগিয়া আমি,
কিছু নাহি বুঝি কিছু না জানি,
দেখি দেখি আর অবাক মানি ।

কেন চলি ফিরি কিসের লাগি
কখন ঘুমাই কখন জাগি,
কত কান্না হাসি দুখে ও সুখে
ক্ষুধা তৃষ্ণা কত বাজিছে বুকে।
জন্ম লভি জীব জীবন ধরে,
কোথায় মিলায় মরণ পরে ?
ভাবিতে ভাবিতে আকুল প্রাণে
ডুবিত মানব গভীর ধ্যানে।
অকূল রহস্য তিমির তলে,
জ্ঞান-জ্যোতির্ময় প্রদীপ জ্বলে,
সমাহিত চিতে যতন করি
অচঞ্চল শিখা সে আলো ধরি
দিব্যজ্ঞানময় নয়ন লভি,
হেরিল নূতন জগৎ ছবি।
অনাদি নিয়মে অনাদি স্রোতে
ভাসিয়া চলেছে অকূল পথে
প্রতি ধূলিকণা নিখিল টানে
এক হতে ধায় একেরি পানে,
চলেছে একেরি শাসন মানি,
লোকে লোকান্তরে একেরি বাণী।
এক সে অমৃতে হয়েছে হারা
নিখিল জীবন-মরণ ধারা।
সে অমৃত জ্যোতি আকাশ ঘেরি,
অন্তরে বাহিরে অমৃত হেরি।
যাঁহা হতে জীব জনম লভে,
যাঁহা হতে ধরে জীবন সবে,
যাঁহার মাঝারে মরণ পরে
ফিরি পুন সবে প্রবেশ করে

তাঁহারে জানিবে যতন ধরি
তিনি ব্রহ্ম তাঁরে প্রণাম করি।
আনন্দেতে জীব জনম লভে
আনন্দে জীবিত রয়েছে সবে ;
আনন্দে বিরাম লভিয়া প্রাণ
আনন্দের মাঝে করে প্রয়াণ।
শুন বিশ্বলোক, শুনহ বাণী
অমৃতের পুত্র সকল প্রাণী,
দিব্যধামবাসী শুনহ সবে—
জেনেছি তাঁহারে, যিনি এ ভবে
মহান পুরুষ, নিখিল গতি,
তমসার পরে পরম জ্যোতি :
তেজোময় রূপ হেরিয়া তাঁরে
স্তব্ধ হয় মন, বচন হারে।
বামে ও দখিনে উপরে নীচে,
ভিতরে বাহিরে, সমুখে পিছে,
কিবা জলেস্থলে আকাশ 'পরে,
আঁধারে আলোকে চেতনে জড়ে ;
আমার মাঝারে, আমারে ঘেরি
এক ব্রহ্মময় প্রকাশ হেরি।
সে আলোকে চাহি আপন পানে
আপনারে মন স্বরূপ জানে।
আমি আমি করি দিবস-যামী,
না জানি কেমন কোথা সে 'আমি'
অচঞ্চল শিখা সে আলো ধরি
দিব্য জ্ঞানময় নয়ন লভি,
হেরিল নূতন জগৎ ছবি।
অনাদি নিয়মে অনাদি স্রোতে

ভাসিয়া চলেছে অকূল পথে
প্রতি ধূলিকণা নিখিল টানে
এক হতে ধায় একেরি পানে,
অজর অমর অরূপ রূপ
নহি আমি এই জড়ো স্তূপ,
দেহ নহে মোর চির-নিবাস
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ।
বিশ্ব আত্মা মাঝে হয়ে মগন
আপন স্বরূপ হেরিলে মন
না থাকে সন্দেহ না থাকে ভয়
শোক তাপ মোহ নিমেষে লয়,
জীবনে মরণে না রহে ছেদ,
ইহ পরলোকে না রহে ভেদ।
ব্রহ্মানন্দময় পরম ধাম,
হেথা আসি সবে লভে বিরাম;
পরম সম্পদ পরম গতি,
লভ তাঁরে জীব যতনে অতি।

॥ ২ ॥

কাল চক্রে হায় এমন দেশে
ঘোর দুঃখ দিন আসিল শেষে।
দশ দিক হতে আঁধার আসি
ভারত আকাশ ফেলিল গ্রাসি।
কোথা সে প্রাচীন জ্ঞানের জ্যোতি,
সত্য অন্বেষণে গভীর মতি;
কোথা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন ধন,
কোথা ঋষিগণ ধ্যানে মগন;
কোথা ব্রহ্মচারী তাপস যত,

কোথা সে ব্রাহ্মণ সাধনা রত ?
একে একে সব মিলাল কোথা,
আর নাহি শুনি প্রাচীন কথা।
মহামূল্য নিধি ঠেলিয়া পায়
হেলায় মানুষ হারাল তায়।
আপন স্বরূপ ভুলিয়া মন
ক্ষুদ্রের সাধনে হল মগন।
ক্ষুদ্র চিন্তা মাঝে নিয়ত মজি,
ক্ষুদ্র স্বার্থ-সুখ জীবনে ভজি ;
ক্ষুদ্র তৃপ্তি লয়ে মূঢ়ের মত
ক্ষুদ্রের সেবায় হইল রত।
রচি নব নব বিধি-বিধান
নিগড়ে বাঁধিল মানব প্রাণ :
সহস্র নিয়ম নিষেধ শত,
তাহে বদ্ধ নর জড়ের মত :
লিখি দাসখত ললাটে তার
রুদ্ধ করি দিল মনের দ্বার।
জ্বলন্ত যাঁহার প্রকাশ ভবে
হায় রে তাঁহারে ভুলিল সবে :
কল্পনার পিছে ধাইল মন,
কল্পিত দেবতা হল সৃজন,
কল্পিত রূপের মূরতি গড়ি,
মিথ্যা পূজাচার রচন করি,
ব্যাখ্যা করি তার মহিমা শত,
মিথ্যা শাস্ত্রবাণী রচিল কত।
তাহে তৃপ্ত হয়ে অবোধ নরে
রহে উদাসীন মোহের ভরে
না জাগে জিজ্ঞাসা অলস মনে,

দেখিয়া না দেখে পরম ধনে।
ব্রাহ্মণেরে লোকে দেবতা মানি
নির্বিচারে শুনে তাহারি বাণী।
পিতৃপুরুষের প্রসাদ বরে
বসি উচ্চাসনে গরব ভরে
পূজা উপচার নিয়ত লভি
ভুলিল ব্রাহ্মণ নিজ পদবী।
কিসে নিত্যকাল এ ভারত ভবে
আপন শাসন অটুট রবে
এই চিন্তা সদা করি বিচার
হল স্বার্থপর হৃদয় তার।
ভেদবুদ্ধিময় মানব মন
নব নব ভেদ করে সৃজন।
জাতিরে ভাঙিয়া শতধা করে,
তাহার উপরে সমাজ গড়ে;
নানা বর্ণ নানা শ্রেণী বিচার,
নানা কূটবিধি হল প্রচার।
ভেদ বুদ্ধি কত জীবন মাঝে
অশনে বসনে সকল কাজে,
ধর্ম অধিকারে বিচার ভেদ
মানুষে মানুষে করে প্রভেদ।
ভেদ জনে জনে, নারী ও নরে,
জাতিতে জাতিতে বিচার করে।
মিথ্যা অহংকারে মোহের বশে
জাতির একতা বাঁধন খসে;
হয়ে আত্মঘাতী ভারত ভবে
আপন কল্যাণ ভুলিল সবে।

॥ ৩ ॥

এখনও গভীর তমসা রাতি,
ভারত ভবনে নিভিছে বাতি—
মানুষ না দেখি ভারতভূমে,
সবাই মগন গভীর ঘুমে।
কত জাতি আজ হেলার ভরে
হেথায় আসিয়া বসতি করে।
ভারতের বুকে নিশান গাঁথি
বসেছে সবলে আসন পাতি।
নিজ ধনমান নিজ বিভব
বিদেশীর হাতে স'পিয়া সব,
ভারতের মুখে না ফুটে বাণী,
মৌন রহে দেশ শরম মানি।
—হেনকালে শুন ভেদি আঁধার
সুগম্ভীর বাণী উঠিল কার—
"ভাব সেই একে ভাবহ তাঁরে,
জলে স্থলে শূন্যে হেরিছ যাঁরে ;
নিয়ত যাঁহার স্বরূপ ধ্যানে
দিব্য জ্ঞান জাগে মানব প্রাণে।
ছাড় তুচ্ছ পূজা জড় সাধন,
মিথ্যা দেবসেবা ছাড় এখন ;
বেদান্তের বাণী স্মরণ কর,
ব্রহ্মজ্ঞান-শিখা হৃদয়ে ধর।
সত্য মিথ্যা দেখ করি বিচার
খুলি দাও যত মনের দ্বার।
মানুষের মত স্বাধীন প্রাণে
নির্ভয়ে তাকাও জগৎ পানে—

দিকে দিকে দেখ ঘুচিছে রাতি
দিকে দিকে জাগে কত না জাতি :
দিকে দিকে লোক সাধনারত
জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলেছে কত।
নাহি কি তোমার জ্ঞানের খনি !
বেদান্ত-রতন মুকুটমণি ?
অসারে মজে কি ভুলেছ তুমি
ধর্মে গরীয়ান ভারতভূমি ?"
—শুনি মৃত দেশ পরান পায়,
বিস্ময়ে মানুষ ফিরিয়া চায়।
দেখে দিব্যরূপ পুরুষবরে
কান্তি তেজোময় নয়ন হরে,
সবল শরীর সুঠাম অতি,
ললাট প্রসর, নয়নে জ্যোতি,
গম্ভীর স্বভাব, বচন ধীর,
সত্যের সংগ্রামে অজেয় বীর :
অতুল প্রখর প্রতিভাবরে
নানা শাস্ত্র ভাষা বিচার করে।
রামমোহনের[১] জীবন স্মরি,
কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি।
দেশের দুর্গতি সকল খানে
হেরিয়া বাজিল রাজার প্রাণে।
কত অসহায় অবোধ নারী
সতীত্বের নামে সকল ছাড়ি,
কেহ স্ব-ইচ্ছায়, কেহ-বা ভয়ে,
শাসন-তাড়নে পিষিত হয়ে,
পতির চিতায় পুড়িয়া মরে—
শুনি কাঁদে প্রাণ তাদের তরে।

নারী দুঃখ-নাশ করিল পণ,
ঘুচিল নারীর সহমরণ।
নিষ্কাম করম-যোগীর মত
দেশের কল্যাণ সাধনে রত,
নানা শাস্ত্রবাণী করে চয়ন,
দেশ দেশান্তরে ঋষিবচন ;
পশ্চিমের নব জ্ঞানের বাণী
দেশের সমুখে ধরিল আনি।
কিরূপেতে পুন এ ভারত ভবে
ব্রহ্মজ্ঞান কথা প্রচার হবে,
নিয়ত যতনে তাহারি তরে,
কত শ্রম কত প্রয়াস করে :
তর্ক আলোচনা কত বিচার
কত গ্রন্থ রচি' করে প্রচার ;
—ক্রমে বিনাশিতে জড় ধরম
'ব্রাহ্ম সমাজ'-এর হল জনম।
শুনে দেশবাসী নূতন কথা,
মূরতিবিহীন পূজার প্রথা :
উপাসনাগৃহ দেখে নূতন
যেথায় স্বদেশী-বিদেশী জন
শূদ্র দ্বিজ আদি মিশিয়া সবে
নির্বিচারে সদা আসন লভে।
মহাপুরুষের বিশাল শ্রমে
দেশে যুগান্তর আসিল ক্রমে।
স্বদেশের তরে আকুল প্রাণ
প্রবাসেতে রাজা করে প্রয়াণ ;
সেথায় সুদূর বিলাতে হায়
অকালেতে রাজা ত্যজিল কায়।

অসমাপ্ত কাজ রহিল পড়ে,
ফিরে যায় লোকে নিরাশ ভরে ;
একে একে সব যেতেছে চলে—
ভাসে রামচন্দ্র[২] নয়ন জলে।
রাজার জীবন নিয়ত স্মরি'
উপাসনা-গৃহে রহে সে পড়ি,
নিয়ম ধরিয়া পূজার কালে
নিষ্ঠাভরে সেথা প্রদীপ জ্বালে।
একা বসি ভাবে, রাজার কাজ
এমন দুর্দিনে কে লবে আজ ?

॥ ৪ ॥

ধনী যুবা এক শ্মশান ঘাটে
একা বসি তার রজনী কাটে।
অদূরে অন্তিম শয়নোপরি
দিদিমা তাহার আছেন পড়ি,
সমুখে পূর্ণিমা গগনতলে,
পিছনে শ্মশানে আগুন জ্বলে,
তাহারি মাঝারে নদীর তীরে
হরিনাম ধ্বনি উঠিছে ধীরে।
একাকী যুবক বসিয়া কূলে
সহসা কি ভাবি আপনা ভুলে।
প্রসন্ন আকাশ চাঁদিম রাতি
ধরিল অপূর্ব নূতন ভাতি,
তুচ্ছ বোধ হল ধন-বিভব
বিলাস বাসনা অসার সব,
অজানা কি যেন সহসা স্মরি
পলকে পরান উঠিল ভরি।

আর কি সে মন বিরাম মানে ?
গভীর পিপাসা জাগিল প্রাণে।
কোথা শান্তি পাবে ব্যাকুল তৃষা
শুধায় সবারে না পায় দিশা।
—সহসা একদা তাহার ঘরে
ছিন্নপত্র এক উড়িয়া পড়ে :
কী যেন বচন লিখিত তায়
অর্থ তার যুবা ভাবি না পায়।
বিদ্যাবাগীশের নিকটে তবে
যুবা সে বাণীর মরম লভে—
"যাহা কিছু এই জগৎতলে
অনিত্যের স্রোতে ভাসিয়া চলে
ব্রহ্মে আচ্ছাদিত জানিবে তায়"—
শুনিয়া যুবক প্রবোধ পায়।
শুনি মহাবাণী চমক লাগে,
আরো জানিবারে বাসনা জাগে :
ব্রহ্মজ্ঞান লাভে পিপাসু মন
গভীর সাধনে হল মগন :
যত ডোবে আরো ডুবিতে চায়—
ডুবি নব নব রতন পায়।
হেনকালে হল অশনিপাত—
যুবকের পিতা দ্বারকানাথ,
অতুল সম্পদ ধন বিভব
ঋণের পাথারে ডুবায়ে সব
কিছু না বুঝিতে জানিতে কেহ
অকালে সহসা ত্যজিল দেহ।
আত্মীয়-স্বজন কহিল সবে,
"যে উপায়ে হোক বাঁচিতে হবে—

কর অস্বীকার ঋণের দায়
নহিলে তোমার সকলি যায়।”
নাহি টলে তায় যুবার মন,
পিতৃঋণ শোধ করিল পণ,
হয়ে সর্বত্যাগী ফকির দীন
ছাড়ি দিল সব শোধিতে ঋণ।
উত্তমর্ণজনে অবাক মানি
কহে শ্রদ্ধাভরে অভয় বাণী,
“বিষয় বিভব থাকুক তব,
মোরা তাহা হতে কিছু না লব।
সাধুতা তোমার তুলনাহীন;
সাধ্যমত তুমি শোধিও ঋণ।”
বরষের পরে বরষ যায়,
যুবক এখন প্রবীণ-প্রায়।
সংসারে বাসনা-বিগত মন,
ঋষিকল্পরূপ ধ্যানে মগন,
ব্রহ্ম-ধ্যান-জ্ঞানে পূরিত প্রাণ,
ব্রহ্মানন্দরস করিছে পান;
বচনেতে যেন অমৃত ঝরে—
নমি নমি তাঁরে ভকতি ভরে।
ব্রাহ্মসমাজের আসন হতে
দীপ্ত অগ্নিময় বচন স্রোতে
ব্রহ্মজ্ঞান ধারা বহিয়া যায়,
কত শত লোকে শুনিতে ধায়।
“ব্রহ্মে কর প্রীতি নিয়ত সবে,
প্রিয়কার্য তাঁর সাধিহ ভবে।
হের তাঁরে নিজ হৃদয় মাঝে,
সেথা ব্রহ্মজ্যোতি নিয়ত রাজে।

জ্ঞান সমুজ্জ্বল বিমল প্রাণে,
যে জানে তাঁহারে ধ্রুব সে জানে।
জানিবার পথ নাহিক আর,
নহে শাস্ত্রবাণী প্রমাণ তাঁর।
বহু তর্ক বহু বিচার বলে
বহু জপ তপ সাধন ফলে
বহু তত্ত্বকথা আলোড়ি' চিতে
নাহি পায় সেই বচনাতীতে।"
ব্রাহ্মসমাজের অসাড় প্রাণে,
মহর্ষির[৩] বাণী চেতনা আনে।
দলে দলে লোক সেথায় ছোটে
উৎসাহের স্রোতে আসিয়া জোটে।
মত্ত অনুরাগে কেশব[৪] ধায়,
প্রতিভার জ্যোতি নয়নে ভায়;
আকুল হয়ে পরাণ খুলি
ঝাঁপ দিল স্রোতে আপনা ভুলি।
হেরি মহর্ষির পুলক বাড়ে,
'ব্রহ্মানন্দ' নাম দিলেন তাঁরে।
লভি নব প্রাণ সমাজ-কায়
নব নব ভাবে বিকাশ পায়:
ধর্মগ্রন্থ নব, নব সাধন,
ব্রহ্ম উপাসনা বিধি নূতন,
ধর্মপ্রাণ কত নারী ও নরে
তাহে নিমগন পুলক ভরে।

॥ ৫ ॥

সমাজে সুদিন এল আবার,
ক্রমে প্রসারিল জীবন তার।

কেশব আপন প্রতিভা বলে
যতনে গঠিল যুবকদলে।
নগরে নগরে হল প্রচার—
"ধর্মরাজ্যে নাহি জাতি বিচার :
নাহি ভেদ হেথা নারী ও নরে,
ভক্তি আছে যার সে যায় ত'রে।
জাতিবর্ণভেদ কুরীতি যত
ভাঙি দাও চিরদিনের মত।
দেশ দেশান্তরে ধাউক মন,
সর্বধর্মবাণী কর চয়ন :
ধর্মে ধর্মে নাহি বিরোধ রবে,
মহা সমন্বয় গঠিত হবে।"
পশিল সে বাণী দেশের প্রাণে,
মুগ্ধ নরনারী অবাক মানে।
নগরে নগরে তুফান উঠে,
ঘরে ঘরে কত বাঁধন টুটে ;
ব্রহ্ম নামে সবে ছুটিয়া চলে,
প্রাণ হতে প্রাণে আগুন জ্বলে।
আসিল গোঁসাই[৫] ব্যাকুল হয়ে
প্রেমে ভরপুর ভকতি লয়ে।
আসিল প্রতাপ[৬] স্বভাব ধীর,
গম্ভীর বচন জ্ঞানে গভীর।
স্বল্পভাষী সাধু অঘোরনাথ[৭]
যোগমন্ত্র মন দিবসরাত।
গৌরগোবিন্দের[৮] সাধক প্রাণ
হিন্দু শাস্ত্রে তাঁর অতুল জ্ঞান।
কান্তিচন্দ্র[৯] সদা সেবায় রত
সেবাধর্ম তাঁর জীবন ব্রত।

ত্রৈলোক্যনাথের[১০] সরস গান
নব নব ভাবে মাতায় প্রাণ।
আরো কত সাধু ধরমমতি
বঙ্গচন্দ্র[১১] আদি প্রচার-ব্রতী
একসাথে মিলি প্রেমের ভরে
প্রেম পরিবার গঠন করে।
কাল কিবা খাবে কেহ না জানে,
আকুল উৎসাহ সবার প্রাণে।
নূতন মন্দির নব সমাজ
নব ভাবে কত নূতন কাজ।
দিনে দিনে নব প্রেরণা পায়,
উৎসাহের স্রোত বাড়িয়া যায়।
সমাজ-চালনা বিধি বিচার
কেশবের হাতে সকল ভার ;
কেশব প্রেরণা সবার মূলে
তাঁর নামে সবে আপনা ভুলে।
ধন্য ব্রহ্মানন্দ যাঁহার বাণী
শিরে ধরে লোকে প্রমাণ মানি।
যাঁহার সাধনা আজিও হেরি
রয়েছে সমাজ জীবন ঘেরি ;
যাঁহার মূরতি স্মরণ করি,
যাঁহার জীবন হৃদয়ে ধরি,
শত শত লোক প্রেরণা পায়—
আজি ভক্তি ভরে প্রণমি তাঁয়।
আবার বহিল নূতন ধারা,
সমাজের প্রাণে বাজিল সাড়া ;
ভাসি বহুজনে সে নব স্রোতে
বাহির হইল নূতন পথে।

মিলি অনুরাগে যতন ভরে
এই "সাধারণ" সমাজ গড়ে।
ওদিকে কেশব নূতন বলে
বাঁধিল আবার আপন দলে।
নব ভাবে "নববিধান" গড়ি,
নূতন সংহিতা রচনা করি,
ভগ্নদেহ লয়ে অবশ প্রায়,
খাটিতে খাটিতে ত্যজিল কায়।

॥ ৬ ॥

ধরি নব পথ নূতন ধারা
নবীন প্রেরণে আসিল যারা
আজি তাহাদের চরণ ধরি
ভক্তিভরে সবে স্মরণ করি।
শাস্ত্রী শিবনাথ সকল ফেলি
বিষয় বাসনা চরণে ঠেলি
বহু নির্যাতন বহিয়া শিরে,
অনুরাগে ভাসি নয়ন নীরে,
সর্বত্যাগী হয়ে ব্যাকুল প্রাণে
ছুটে আসে ওই কিসের টানে?
দেখ ওই চলে পাগল মত
ভক্তশ্রেষ্ঠ বীর বিনয়নত,
বিজয় গোঁসাই সরল প্রাণ—
হেরি আজি তাঁর প্রেম বয়ান।
সাধু রামতনু[১২] জ্ঞানে প্রবীণ,
শিশুর মতন চির নবীন।
শিবচন্দ্র দেব সুধীর মন
কর্মনিষ্ঠাময় সাধু জীবন।

নগেন্দ্রনাথের[১৩] যুকতিবাণে
কূটতর্ক যত নিমেষে হানে
আনন্দমোহন[১৪] প্রেমে উদার
আনন্দ-মোহন মূরতি যার
উমেশচন্দ্রের[১৫] জীবন মন,
নীরব সাধনে সদা মগন।
দুর্গামোহনের[১৬] জীবন গত
সমাজের সেবা দানের ব্রত।
দ্বারকানাথের[১৭] স্মরণ হয়
ন্যায়ধর্মে বীর অকুতোভয়।
পূর্ববঙ্গে হোথা সাধক কত
নবধর্মবাণী প্রচারে রত।
সংসারে নির্লিপ্ত ভাবুক প্রাণ
সার্থক প্রচারে কালী নারা'ণ[১৮]—
কত নাম কব, কত যে জ্ঞানী,
কত ভক্ত সাধু যোগী ও ধ্যানী;
কত মধুময় প্রেমিক মন,
আড়ম্বরহীন সেবকজন;
আসিল হেথায় আকাশ ভরে
সবার যতনে সমাজ গড়ে।
এই যে মন্দির, হেরিছ যার
ইঁটকাঠময় স্থূল আকার;
ইহারি মাঝারে কত যে স্মৃতি,
কত আকিঞ্চন সমাজপ্রীতি,
ব্যাকুল ভাবনা দিবসরাত
বিনিদ্র সাধনে জীবনপাত।
বহু কর্মময় এই সমাজ
সে সব কাহিনী না কব আজ,—

আজিকে কেবল স্মরণে আনি
ব্রাহ্ম সমাজের মহান্ বাণী।
যে বাণী শুনিনু রাজার মুখে,
মহর্ষি যাহারে ধরিল বুকে,
কেশব যে বাণী প্রচার করে—
স্মরি আজ তাহা ভকতি ভরে।
রক্তাক্ষরে লিখা যে-বাণী রটে
এই সমাজের জীবন পটে—
"স্বাধীন মানব হৃদয়তলে
বিবেকের শিখা নিয়ত জ্বলে।
গুরুর আদেশ সাধুর বাণী
ইহার উপরে কারে না মানি।"
স্বাধীন মনের এই সমাজ
মুক্ত ধর্মলাভ ইহার কাজ।
হেথায় সকল বিরোধ ঘুচি
রবে নানা মত নানান্ রুচি,
কাহারো রচিত বিধি বিধান
রুধিবে না হেথা কাহারো প্রাণ।
প্রতি জীবনের বিবেক ভাতি
সবার জীবনে জ্বলিবে বাতি।
নরনারী হেথা মিলিয়া সবে
সম অধিকারে আসন লভে।
'প্রেমেতে বিশাল, জ্ঞানে গভীর,
চরিত্রে সংযত, করমে বীর;
ঈশ্বরে ভকতি, মানবে প্রীতি,—
হেথা মানুষের জীবন নীতি।
ফুরাল কি সব হেথায় আসি?
আসিবে না প্রেম জড়তা নাশি?

জাগিবে না প্রাণ ব্যাকুল হয়ে,
নব নব বাণী জীবনে লয়ে?
জ্বলিবে না নব সাধন শিখা?
নব ইতিহাস হবে না লিখা?
চিররুদ্ধ রবে পূজার দ্বার?
আসিবে না নব পূজারী আর?
কোথাও আশার আলো কি নাহি?
শুধাই সবার বদন চাহি।

**পাদটীকা :** (১) রামমোহন রায় (২) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (৩) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪) কেশবচন্দ্র সেন (৫) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (৬) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (৭) অঘোরনাথ গুপ্ত (৮) গৌরগোবিন্দ রায় (৯) কান্তিচন্দ্র মিত্র (১০) ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১১) বঙ্গচন্দ্র রায় (১২) রামতনু লাহিড়ী (১৩) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৪) আনন্দমোহন বসু (১৫) উমেশচন্দ্র দত্ত (১৬) দুর্গামোহন দাস (১৭) দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮) কালীনারায়ণ গুপ্ত।

## কালিদাস রায়

### আর্যাবর্ত

'নিম্নে' অই মহাসিন্ধু সর্বরত্ন-খনি,
বরুণের কোষাগার লক্ষ্মীর নিবাস,
ঐহিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির আশ্বাস,
অনন্তের শীর্ষে যথা জ্বলে কোটি মণি।
'ঊর্ধ্বে' অই ভারতের দৃষ্টি সনাতনী
হিমাদ্রির শৃঙ্গরূপে বিদরে আকাশ,
নামে তাহে পুণ্য ব্রহ্মধারা বারমাস।
অই মন্দাকিনী শুভ ধ্রুবের জননী,
মহাযোগ-ধারা, এই ভস্ম-সঞ্জীবনী
স্বর্গে মর্তে, অনিত্যে ও নিত্যসত্তা সনে
শ্রেয়ে-প্রেয়ে, গৌরী-হরে, লক্ষ্মী-নারায়ণে,
শক্তি-প্রেমে, ভক্তি-জ্ঞানে যোগ সম্মিলনী।
ইহ পরত্রের মহা মিলন-নিলয়
এই আর্যাবর্তে সর্ব দ্বন্দ্ব-সমন্বয়!

# দিলীপকুমার রায়

## আজ দেখা দিলে

আজ দেখা দিলে ঝলকি নিখিলে মৃন্ময়ী মাগো কালো নিশায়
বিদলি তিমির চিরন্তনীর বিলায়ে আশিস আলো-শিখায়।
আমরা যে সাড়া দিই ক্ষণে ক্ষণে
মিথ্যামলিন কামনা-কূজনে
সাধিয়া আঁধার শুনি না তোমার শঙ্খ যে ডাকে:
"আয় রে আয়!"
তাই কি অশনি মন্দ্রি জননি জাগালে তন্দ্রালস হিয়ায়॥

মাটি নও তো মা, তুমি নিরুপমা! চিন্ময় তব প্রতি অণু
এসেছেন যুগে যুগে তব বুকে নারায়ণ ধরি নর তনু।
তোমারি তো ডাকে গোলোক-মুরলী
কত শত প্রাণ পুলকে উছলি
শ্যামল করুণা কোমল যমুনা বহাল বৃন্দাবন-লীলায়।
তোমার আকাশে তোমার বাতাসে আজো সে অমরা
স্মৃতি বিছায়॥

কত কবি গুণী, যোগী ঋষি মুনি নমি মা তোমার ধূলিকণা
হয়েছে ধন্য চিরবরেণ্য—অলখ উচ্ছ্বাসে উন্মনা।
তোমারি কোলে মা গগন-গঙ্গা
ধায় গেয়ে গান নীলতরঙ্গা
তপনবাহিনী! মরণতারিণী! কৈলাস শিরে তোমায় চায়
কনককান্ত ধ্যান প্রশান্ত যুগ-যুগান্ত বন্দনায়॥

আজি প্রার্থনা : তোমার সাধনা পল তরেও না যেন ভুলি।
ত্যজিয়া স্বার্থ যেন পরার্থ ব্রতে অন্তর উঠে দুলি।
যেন পারি মাগো তোমার প্রসাদে
আপনারে দিতে বিলায়ে দু'হাতে
প্রতি জীব মাঝে যে শিব বিরাজে বরি তারে তাপিতের সেবায়।
আজ দেখা দিলে স্বরূপে নিখিলে প্রেমের প্রতিমা মধুরিমায়॥
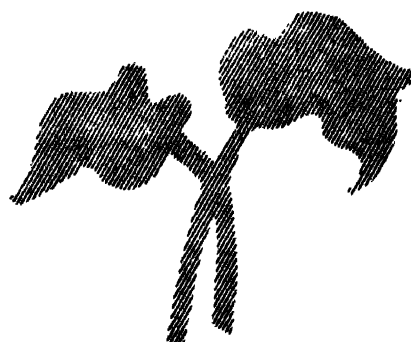
# কাজী নজরুল ইসলাম

## শিকল-পরার গান

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের কর্‌ব রে বিকল।
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় কর্‌তে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল॥

তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে কর্‌ছ বিশ্বগ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই কর্‌বে ভাব্‌ছো বিধির-শক্তি হ্রাস।
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা কর্‌ব সর্বনাশ,
এবার আনবো মাভৈঃ—বিজয় মন্ত্র বলহীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে কর্‌ব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যু জয়ের ফল॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥

## কাজী নজরুল ইসলাম

### কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা, হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্তসঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

গিরিসংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথমাঝ?
ক'রে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়েছ যে মহাভার।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে যে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী, হুঁশিয়ার।
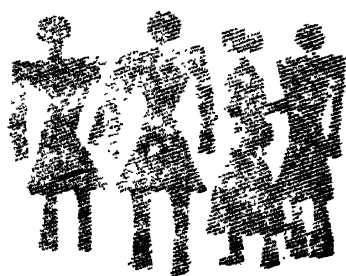
## জীবনানন্দ দাশ

### হিন্দু-মুসলমান

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে সুরে!
আহ্নিক হেথা শুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,
মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনেগগনে বাজে;
জাগে ইদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা-উষার বেদবাণী যায় মিশে কোরানের স্বরে;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা,—মিশে গেছে হেথা মস্‌জিদ, মন্দির!

কে বলে হিন্দু বসিয়া রয়েছে, একাকী ভারত জাঁকি'?
মুসলমানের হস্তে হিন্দু বেঁধেছে মিলন-রাখী;
আরব-মিশর-তাতার-তুর্কী-ইরানের চেয়ে মোরা
ওগো ভারতের মোস্‌লেম্ দল,—তোমাদের বুক-জোড়া!
ইন্দ্রপ্রস্থ ভেঙেছি আমরা,—আর্য্যাবর্ত ভাঙি'
গড়েছি নিখিল নতুন ভারত নতুন স্বপনে রাঙি'!
—নবীন প্রাণের সাড়া
আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্তবেণীর ধারা!

রুমের চেয়েও ভারত তোমার আপন,—হেথায় তোমার প্রাণ!
—হেথায় তোমার ধর্ম অর্থ,—হেথায় তোমার ত্রাণ;
হেথায় তোমার আশান ভাই গো, হেথায় তোমার আশা;
যুগ যুগ ধরি এই ধূলিতলে বাঁধিয়াছ তুমি বাসা,
গড়িয়াছ ভাষা কল্লে কল্লে দরিয়ার তীরে বসি',
চক্ষে তোমার ভারতের আলো,—ভারতের রবি শশী,

হে ভাই মুসলমান,
তোমাদের তরে কোল পেতে আছে ভারতের ভগবান!

এ ভারতভূমি নহেক' তোমার, নহেক' আমার একা,
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ,—মুসলমানের রেখা;
—হিন্দু মনীষা জেগেছে এখানে আদিম উষার ক্ষণে,
ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে!
পাটলীপুত্র-শ্রাবস্তী-কাশী-কোশল-তক্ষশীলা
অজন্তা আর নালন্দা তার রটিছে কীর্তিলীলা!
—ভারতী কমলাসীনা
কালের বুকেতে বাজায় তাহার নবপ্রতিভার বীণা!

এই ভারতের তখ্‌তে চড়িয়া শাহানশাহার দল
স্বপ্নের মণি-প্রদীপে গিয়েছে উজলি' আকাশতল!
—গিয়েছে তাহারা কল্পলোকের মুক্তার মালা গাঁথি',
পরশে তাদের জেগেছে আরব-উপন্যাসের রাতি!
জেগেছে নবীন মোগল-দিল্লী,—লাহোর,—ফতেহ্‌পুর,
যমুনা জলের পুরনো বাঁশীতে জেগেছে নবীন সুর
নতুন প্রেমের রাগে
তাজমহলের অরুণিমা আজও উষার অরুণে জাগে!

জেগেছে হেথায় আকবরী আইন,—কালের নিকষকোলে
বার বার যার উজল সোনার পরশ উঠিছে জ্বলে'!
সেলিম—সাজাহাঁ—চোখের জলেতে একশা করিয়া তারা
গড়েছে মীনার মহলা স্তম্ভ কবর ও শাহদারা!
—ছড়ায়ে রয়েছে মোগল ভারত,—কোটি সমাধির স্তূপ
তাকায়ে রয়েছে তন্দ্রাবিহীন,—অপলক, অপরূপ!
—যেন মায়াবীর তুড়ি
স্বপনের ঘোরে স্তব্ধ করিয়া রেখেছে কনকপুরী!

মোতিমহলের অযুত রাত্রি,—লক্ষ দীপের ভাতি
আজিও বুকের মেহেরাবে যেন জ্বালায়ে যেতেছে বাতি!
—আজিও অযুত বেগম-বাঁদীর শষ্প-শয্যা ঘিরে'
অতীত রাতের চঞ্চল চোখ চকিতে যেতেছে ফিরে'!
দিকে দিকে আজও বেজে ওঠে কোন গজল-ইলাহী গান!
পথহারা কোন্ ফকিরের তানে কেঁদে উঠে সারা প্রাণ!
—নিখিল ভারতময়
মুসলমানের স্বপন—প্রেমের গরিমা জাগিয়া রয়!

এসেছিল যারা ঊষর ধূসর মরুগিরিপথ বেয়ে',
একদা যাদের শিবিরে-সৈন্যে ভারত গেছিল ছেয়ে,
আজিকে তাহারা পড়শী মোদের,—মোদের বহিন-ভাই;
—আমাদের বুকে বক্ষ তাদের,—আমাদের কোলে ঠাঁই।
'কাফের' 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে,—ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,
মোস্‌লেম বিনা ভারত বিকল,—বিফল হিন্দু বিনা;
—মহামৈত্রীর গান
বাজিছে আকাশে নব ভারতের গরিমায় গরীয়ান।

# অমিয় চক্রবর্তী

## দূরের ভাই

কার স্বদেশে এসেছো জেনো, দূরের ভাই।
ভারতমাটির ধুলো
নীলাম্বরের আকাশ তলে অরণ্যে
মনে মনেই কপালে তুলো।
অচেনা মাঠ, নদীর ঘাট, লক্ষ গ্রাম, সংসারে
এখানে প্রাণ পেয়েছে পুজো
তাকেই খুঁজো
দেশকে পাবে আপন লোকের বুকে।
ঝড়ের মুখে
দুর্যোগের যোগে হঠাৎ এসেছ তাই, দূরের ভাই
ভিতরে এসে দরজা খুলো।

দৈন্য যখন কলির ঝড়,
সাতসমুদ্র-শূন্য-ডাঙায় বলির ঝড়,
অন্নহারা বাংলাদেশ,
সোনার ধান নিরুদ্দেশ:
মুক্তিহীন চলে কঠিন নিয়ন্ত্রণ—
চেয়ো না খুশীর নিমন্ত্রণ।
অন্ধযুগের কারা।
সর্বনাশের চরমে তবু টুটল যারা, সর্বহারা
কালো লগ্নে শুনো তাদের বাজে তূর্য—
কোটি সূর্য
কোটি প্রাণের জাগল তলে রক্তরাঙা
রাত্রি-ভাঙা।
মুক্ত হাওয়ায় দেশী তোমরা দূরের ভাই, এসেছ তাই
নতুন দিনের দরজা খুলো॥

# সুনির্মল বসু

## পতাকা-উত্তোলন

হের হের সবে মহাগৌরবে পতাকা-উত্তোলন,
এ পতাকা-তলে এসো দলে দলে কিশোর-কিশোরীগণ।
গৈরিক-শ্বেত-হরিতে রঙিন,
মাঝেতে অশোক-চক্রের চিন্,
মহাভারতের প্রতীক স্বাধীন—এ পতাকা অনুখন;
এ পতাকা-তলে এসো দলে দলে কিশোর-কিশোরীগণ।

গৈরিক রং 'ত্যাগ-সংযম' করিতেছে ইঙ্গিত,
শুভ্র বর্ণে 'শান্তি-সত্য', সকলের যাতে হিত।
সবুজ বর্ণ হের বার বার—
'নিষ্ঠা সাহস' করিছে প্রচার,
অশোক-চক্র গতি দুর্বার দুর্গতি বিনাশন;
এ পতাকা-তলে এসো দলে দলে কিশোর-কিশোরীগণ।

এই সে পতাকা—যা'রে একদিন বর্বর, শয়তান—
দলেছিল পায়ে, আগুনে পোড়ায়ে করেছিল অপমান।
এই সে পতাকা, মুরতি যাহার
সহিতে না পারি শাসকেরা আর
আইনের ফাঁদে টুঁটি টিপিবার করেছিল আয়োজন;
এ পতাকা-তলে এসো দলে দলে কিশোর-কিশোরীগণ।

এই তিনরঙা পতাকার মাঝে লুকানো যে ইতিহাস
ছড়ানো যে-সব গৌরব-গাথা, জড়ানো যে বিশ্বাস,
তুলনা তাহার মিলিবে কোথায়?
কত আঁখিজল ও-রঙে শুকায়,
কত রঙের ঢেউ বয়ে যায়, কে করে তা বর্ণন?
এ পতাকা-তলে এসো দলে দলে কিশোর-কিশোরীগণ।

এ পতাকা ধরে' সহে কত ক্লেশ ভারতের সন্তান,
কত নরনারী বরিল মরণ রাখিতে ইহার মান।
ধ্বংসে হয়েছে কত পরিবার,
স্ফুরণ হোলো না কত প্রতিভার,
মর্যাদা দিতে এই পতাকার করিল মৃত্যুপণ;
এ পতাকা-তলে এসো দলে দলে কিশোর-কিশোরীগণ।

বিদেশী শাসক দূরে অপগত, শোষণের হোলো শেষ,
সিংহের সাথে সংগ্রাম ক'রে মোরা ফিরে পেনু দেশ।
জয় নেতাজীর, মহাত্মাজীর,
জয় জয় যত দেশ-কর্মীর,
মৃত্যু বরিল যত শত বীর, গাহ জয় আজীবন।
এ পতাকা-তলে এসো দলে দলে কিশোর-কিশোরীগণ।

এই পতাকার তলে আমাদের মলিনতা ঘুচে যাক্
এ তিন রঙের মহিমার জ্যোতি অন্তরে জাগা থাক্।
সত্য-ন্যায়ের হব সৈনিক,
হব সংযমী, হব নির্ভীক,
শান্তির বাণী ঘোষি চারিদিক্ করিব আন্দোলন;
এ পতাকা তলে এসো দলে দলে কিশোর-কিশোরীগণ।

এসো করি পণ, ভাই-বোনগণ, রাখিব ইহার মান—
এই পতাকার মর্যাদা দিতে করিব জীবন দান।
এ দেশ হইবে সবার প্রধান,
গুণে মানে আর জ্ঞানে গরীয়ান,
দেশে দেশে এই মুক্তি-নিশান পাবে অভিনন্দন;
এ পতাকা-তলে এসো দলে দলে কিশোর-কিশোরীগণ।

## প্রেমেন্দ্র মিত্র

### স্বাদেশিক

খুঁজতে যাব না দূর প্রাগৃষার তিমিরে
অস্থি কি করোটির সাক্ষ্য।
কি-ই বা বলবে শিলালেখ কি তাম্রলিপি?
প্রত্নবিদের খনিত্র
সময়ের সমাধিই শুধু খোঁড়ে।

ভূতত্ত্ব জানে
অর্বাচীন এক পাললিক সঞ্চয়ের বৃত্তান্ত
ক্ষয়িক গৈরিকের ধ্রুপদাঙ্কে
স্বৈরিণী নদীরা যেখানে নৃত্যপরা;
আর পুরাণ নিয়ে যেতে পারে
স্মরণ-সীমার সেই আলো-আঁধারিতে
আর্য দম্ভের কানে
প্রাক্‌কণ্ঠ যখন পক্ষীরব,
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী
দ্বিতীয় কোন পুণ্ড্র-বাসুদেবের স্পর্ধা
উন্নাসিক কুরু-পঞ্চালে উপহসিত।

ইতিহাস অবশ্য শোনাবে
অর্ধবিশ্বজয়ী অপ্রতিরোধ্য এক বাহিনীর
সশঙ্ক সচকিত হৃদ্‌কম্পন।

সে দুর্বার প্রলয়তরঙ্গ
সহসা যাতে হয়েছিল নিশ্চল
অজানার আতঙ্ক-জাগানো
সে এক কিংবদন্তী-বন্দিত নাম,
—যাবনিক জিহ্বায় বিকৃত,—গঙ্গারুদি !
শুধু সে নাম কেন,
এ মাটিতে কান পাতলে
বিস্মৃতি বিলীন কত যুগান্ত
আবার হবে সরব।
শোনা যাবে মাৎস্যন্যায়ের মন্থনান্তে
কোটি কণ্ঠে কল্লোলিত
একটি নামের জয়ধ্বনি,
গোপালদেব ! গোপালদেব !
তেমনি আবার আকাশ-কাঁপানো উল্লাসে।
বিপ্লব নায়ক দিব্যোক !
ইতিহাসের অবিরাম ঘূর্ণাবর্তে
উত্তাল কত না মুহূর্ত !
কী দুরন্ত নাট্যপ্রবাহ পতন অভ্যুদয়ের !

তবু সেখানেও খুঁজব না তার রহস্য
আমার অস্থি মজ্জায় যা স্মৃতি ও স্বপ্ন,
সঙ্কল্প হয়ে, ধ্বনিত আমার হৃদ্‌স্পন্দনে,
আমার দৃষ্টিতে যা দীপ্তি,
আর নিজেকেই চেনবার
চিরন্তন অভিজ্ঞান চেতনার গহনে।

এ দেশ-চেতনার হদিশ
পুরাণ-ইতিহাসের অতীত !

তান্ত্রিকদের গরকলা ঢাকা চোখ
তার খোঁজ রাখে না।
পাললিক ইতিবৃত্তে তা নেই
নেই কোনো পুরাবিদের পুথিপত্রে।
ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টানো
বারে বারে ছেঁড়া আর
খেয়ালের তালমারা
রাজনীতির মানচিত্রে
তা মেলে না।

আমার স্বদেশ
ভৌগোলিক এক মৃন্ময়
বিবর্তন-বিধাতার বুঝি
কিমাশ্চর্য কিমিতি,
সমতল দিগন্তের দেশে
মানুষকেই যা করে অভ্রভেদী,
পলিমাটির পেলবতা যাতে হয় বজ্রকঠিন

বাঁচতে আকুল, মরতে অভীক
বিষামৃতের অবাক দেশ—
প্রণতি নাও।
শান্তি নয়,
জীবন দাও মৃত্যুফেনিল।

## প্রেমেন্দ্র মিত্র

## ফেরারী ফৌজ

নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা,
সুমের, আকাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে,
বার বার নানা শতাব্দীর
আকাশ উঠেছে জ্ব'লে, ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে,
সেই সব সেনাদের
চিনি, আমি চিনি;
—সূর্যসেনা তারা,
রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো
সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী।

মাঝরাতে একদিন
বিছানায় জেগে উঠে বসে,
সচকিত হ'য়ে তারা
শুনেছে কোথায় শিঙা বাজে,
সাজো সাজো, ডাকে কোন অলক্ষ্য আদেশ।
জনে জনে যুগে যুগে
বার হ'য়ে এসেছে উঠানে,
আগামী দিনের সূর্য দেখেছে আঁধারে
গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে সারা আকাশে ছড়ানো।

সহসা জেনেছে তারা,
এইসব সূর্য-কণা তিল-তিল ক'রে
ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে কালের দিগন্তে,
রাত্রির শাসন ভাঙা
ভয়ংকর চক্রান্তের গুপ্তচর রূপে।

এক-একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে,
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে ব'লে
তারা সব হয়েছে বাহির।

সুদূর সীমান্ত হায়
তারপর সরে গেছে প্রতি পায়ে পায়ে;
গাঢ় কুজ্ঝটিকা এসে
মুছে দিয়ে গেছে সব পথ;
ভয়ের তুফান-তোলা রাত্রির ভ্রুকুটি
হেনেছে হিংসার বজ্র।
দিখিদিক-ভোলানো আঁধারে
কে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে।

রাত্রির সাম্রাজ্য তাই এখনো অটুট.
ছড়ানো সূর্যের কণা
জড়ো করে যারা
জ্বালাবে নতুন দিন,
তারা আজো পলাতক,
দলছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে
তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে শাণিত বিদ্যুৎ
কত ম্লান শতাব্দীর প্রহর ধাঁধিয়ে
কোথা কোন লুকানো কৃপাণে
ফেরারী সেনার।

এখনো ফেরারী কেন?

ফেরো সব পলাতক সেনা

সাত সাগরের তীরে

ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো:

আনো সব সূর্য-কণা

রাত্রি মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।

—এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হ'ল ফেরারী ফৌজের।

## অন্নদাশঙ্কর রায়

### খুকু ও খোকা
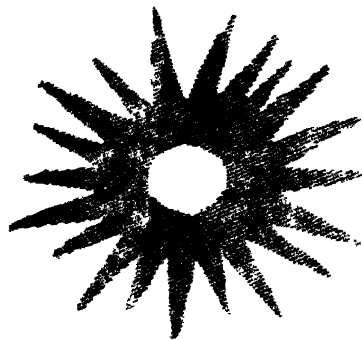
তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী।
তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিস-ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর!
তার বেলা?

যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট!
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

## বিষ্ণু দে

### প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

চেয়েছি অনেকদিন
আজো তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
কখনো বা পাশ দিয়ে কখনো আড়ালে
কখনো বা দেশান্তরে কখনো বা চোখাচোখি
কখনো বা ডাকে কানে কানে কাছাকাছি
নিশ্বাসের তাপে একান্ত আপন ছন্দময়
বুঝি বা অলক তার কাঁপে আমার কপালে
কখনো হাওয়ায় লাগে হাওয়া

তবু তাকে পাওয়া আজো হল না নিঃশেষ
বাহুর নাগালে নেই অস্পষ্ট অধরা
অথচ সূর্যের মতো সত্য মাটি যেন ফসলের কাছে
পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রত্যক্ষ অথচ
অতনু প্রবাহ তার
রক্তে তার পদধ্বনি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে
স্বপ্নে তার হৃদয় সদাই শ্রাবণের তালদীঘি
উত্তরাধিকারে তার দীর্ঘ অঙ্গীকার প্রেরণা পৌরুষে

তবু তাঁকে খুঁজি সারাক্ষণ—
খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধারণে জনতায় চকিতে নিবিড়ে
জুর্গতির ব্যাপ্ত দায়ভাগে নিশ্চিত আশ্বাসে
জনগণে জনসাধারণে দেশের মানুষে
যে যার আপন কাজে রচনায় রচনায়
মনে হয় দেখা বুঝি মেলে
সমুদ্রে সমুদ্রে দেখি আবেগকল্লোলে
এই বুঝি আবির্ভাব

সাগরউত্থিতা উল্লাসে উল্লাসে শপথে শপথে
দীপ্ত মিলিত ভাষায়
লবণাম্বুরাশিনিবদ্ধধারায় মেলে বনরাজিনীলা
সভায় মিছিলে তোমাদের আমাদের ভিড়ে
সমুদ্র সে সমুদ্রই নয় বুঝি আকস্মিক বান বুঝি
গান শুধু হঠাৎ জোয়ার
উল্লাস উদ্‌ভ্রান্ত মরু ঠেলাঠেলি অন্ধ অহংকার
ক্ষমতার পাতাল সন্ধান প্রায় আত্ম অচেতন

পালায় সে মেঘে মেঘে বজ্রে ও বিদ্যুতে
মোহনায় ভাঁটায় ভাঁটায়
আষাঢ়ের অশ্রুহীন হঠাৎ সন্তাপে
রেখে যায় ছায়া শুধু হাওয়া শুধু রেশ
আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায়

সেই ছায়া রাতদিন খুঁজে ফিরি সেই হাওয়ায়
রক্তে আঁকি সেই ছদ্মবেশ একান্ত আপন
তালীতমালের বনে মৃত্যুবাঁধা রাজপথে
তোমাদের আমাদের সামনে আড়ালে তাকে
বারবার আজো সারাক্ষণ—
অস্পষ্ট আসন্ন তবু যেন বা সে
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ ॥
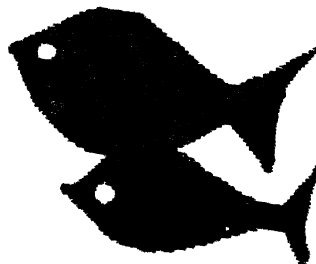
## বিষ্ণু দে

### ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪৮

অনেক অনেক মৃত্যু, ঘৃণ্য মৃত্যু, অপঘাত,
ঘাটে ঘাটে পলিমাটি ছেয়ে গেছে শবে।
গঙ্গার যমুনার মেঘনার শতদ্রুর অশ্রুর প্রপাত,
রক্তমাখা ক্রূর শত অন্ধ ক্ষমতার হত্যার উৎসবে
পিতৃপিতৃব্যের পাপে
ছেয়ে গেছে সারা দেশ দোয়াব, পঞ্জাব বদ্বীপ সন্দ্বীপ
এ নদীমাতৃক দেশ জননী এ জন্মভূমি।

শকুনের ডানার ঝাপট শিবার ফুৎকার
আর্য্যাবর্ত্ত চষে খায় নিবে যায় সভ্যতার হাজার প্রদীপ।

তবু তুমি হিমালয়,
হাজার নদীর উৎস,
মানসহ্রদের স্বচ্ছ সূর্য্যালোক,
এ নদীমাতৃক দেশ প্রাজ্ঞ পিতামহ
বিরাট আকাশ,
মৃত্যুঞ্জয়, প্রাণবহ,
পৃথিবীর মানদণ্ড
সমুদ্রে সমুদ্রে ন্যস্ত দুই হাত:

শকুন সেখানে মরে রুদ্ধশ্বাস, কৈলাস হাওয়ায়
শিবা মরে আপন কামড়ে, সেই প্রাণের চূড়ায়,
যেখানে ঠিকরে ত্রিনয়নে রুদ্র রৌদ্র প্রেমের প্রসাদ
গিরিশের তুষার মুকুরে।

শঙ্খচূড় অজয় অবশ প'ড়ে যায় ঝ'রে যায় সর্পিল মন্থর
পুড়ে যায় শূন্যে শূন্যে ছিঁড়ে যায় কুটিল কুণ্ডলী
ঊর্ধ্ববাহু নেমে যায় ঘৃণ্য রসাতলে।
জীবনে জীবন দিলে মরণে জীবন তুমি, জীবন মৃত্যুর হলাহলে
তেজ দিল মুছে'
ধুয়ে দিলে মন্দাকিনী নির্ঝর শীকরে।

নদীতীরে শুভ্র সূর্যালোকে
মিলি শোকে, জীবনের বাণী
আমি গ্লানির তর্পণে, আমাদেরও গ্লানি
আমাদেরও পাপ তোমার এ মৃত্যু অভিশাপ
এনে দিলে ঘৃণার শপথ, ঘৃণ্য জিঘাংসু উন্মাদ ক্ষমতার প্রতিরোধে
মিলিত দুর্জয়
তোমার পৌত্রেরা আর দৌহিত্র প্রপৌত্র অগণন

শোক আজ স্বচ্ছস্রোত ক্রোধ মৈত্রী খরতোয়া
জনসাধারণ
আমাদের বিদীর্ণ হৃদয়ে ॥

## নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

### ভারত : ১৯৬২

জননী ভারতবর্ষ বার বার তোমাকে প্রণাম,
তোমার জাগ্রত মূর্তি ভাস্বর রাখব চিরদিন
কোন দৃপ্ত লুব্ধ দস্যু, মঙ্গল তাতার হুন চীন,
পারবে না পা বাড়াতে এ মাটিকে আশ্বাস দিলাম!
রক্তের অক্ষরে লিখে আন্তরিক শপথ নিলাম,
তোমার পতাকা রাখব নভস্তলে সু-চির উড্ডীন,
দ্বিধাহীন দুঃসাহসে সংকটের হয়ে সম্মুখীন
অকাতরে প্রাণ দোব, অম্লান রাখতে মাতৃনাম!
উত্তরে অতুঙ্গ গিরি এ ঘোষণা শোন কান পেতে,
দক্ষিণে পশ্চিমে পূর্বে সমুদ্রের উদ্দাম জলধি
তোমরাও শুনে রাখ, এ সংগ্রামে পিছু হটি যদি
ধিক্কারে লাঞ্ছিত হই যেন বিশ্ব লোকালয়ে যেতে।
আমরা স্বভাবে শান্ত, তা বলে নইক কাপুরুষ,
সম্ভ্রম আহত হলে জেগে ওঠে জ্বলন্ত পৌরুষ!

## জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

### এসো মুক্ত করো

এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার
এসো শিল্পী, এসো বিশ্বকর্মা, এসো স্রষ্টা
রসরূপ মন্ত্রদ্রষ্টা
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো, বন্ধনের অন্ধকার।

ভেঙেছে যে জীবনের শৃঙ্খল
দুর্গত দলিতেরা পায় বল
এ শুভ লগ্নে তাই তোমারে স্মরণ করি রূপকার
এসো মুক্ত করো হে এই দ্বার।

উঠেছে যে জীবনের লক্ষ্মী
মৃত্যু-সাগর মন্থনে
নূতন পৃথিবী চায় শিল্পীর বরাভয়
নব মুক্তির শুভক্ষণে—

এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে
এসো জনতার মুখরিত সখ্যে
এসো দুঃখ তিমির ভেদি দুর্গম ধ্বংসের
নিষ্ঠুর ভয় করি চূর্ণ
এসো প্রাণের ভবন করি পূর্ণ।
এসো মুক্ত কর এই দ্বার।

## দিনেশ দাস

### ভারত ছাড়ো : ১৯৪২

শেষ হল সাম যজু অথর্ব ঋক্
হাঁক দেয় ওই কালের দৌবারিক :
শেষ পাতা শেষ হল,
হে নাবিক, পাল তোলো !

চেয়ে ছাখো কত যোজন দীর্ঘ পড়ে আছে আড়াআড়ি
চল্লিশকোটি জীবনের বালিয়াড়ি,
অগ্নি-তামাটে প্রখর সৌরকরে
বালি আর কঙ্করে :
এই বালুময় সময়ের সৈকতও
তোমার চরণ-চিহ্নেও সেতো রয়ে গেল অক্ষত !

আরবের মরু উচ্ছল হল মামুদের গজনীতে
তারই ঢেউ লাগে খাইবার গিরিবক্ষের ধমনীতে,
আজো নিশ্বাসে মেশা
চেঙ্গিস খাঁর শাণিত অশ্বহ্রেষা,
গুজরাটে কর্ণাটে
ঘোঁড়া তৈমুর হাঁটে।

তোমার ঝরনা আমার প্রাণের গঙ্গায় মেশে নি তো
শ্বেত গৈরিকে হয় নাই চিহ্নিত,
ভারতসাগর হতে দেখি আমি দূরতম প্যাসিফিকে,
তোমার নেহাই আলো দেয় নি কো, তাপ দিল দিকে দিকে
দূর বোর্নিও-মালয়-যবদ্বীপ
জ্বলে নি কোথাও তোমার জীবন দীপ।

তুমি তো আঁকো নি, ইতিহাস-পাড়ে প্রাণের স্বর্ণছবি
গড়ো নি কখনো নিটোল ভৌগোলিক,
নতুন দ্বীপের পুঞ্জে জাগে নি নারিকেল মঞ্জরী
প্রাণের মাঙ্গলিক।
হে নাবিক, হে নাবিক,
পাল তোলো, পাল তোলো!
শেষ পাতা শেষ হ'ল!

## দিনেশ দাস

### বেতার : ১৯৪৩
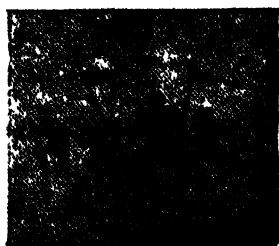
রাতের বেতারে
ছড়াল কে মুঠো মুঠো কাঁচা প্রাণ ইথারে ইথারে
মুমূর্ষু ভারত জাগে
বিস্তীর্ণ ভূভাগে,
জ্বালে দীপ
যবদ্বীপ
ইন্দোনেশিয়ায়
এসিয়ায়।

ভূগোল
শুনেছে শুধু দুনিয়ার যত সোরগোল,
সাইক্লোন আসে যায় শতকের বাঁকে,
কে বা মনে রাখে?
পার হয়ে ইতিহাস-ভূগোলের সীমা
লণ্ডন, স্ট্যালিনগ্রাড আর হিরোসিমা
অন্তর নিভৃতে লীন
সাইগন-বার্লিন।

আমার এ ফিকে-লাল বুদ্ধির মলাটে
সারাদিন ধুলো জমে দুপুরের হাটে
বুদ্ধির উজ্জ্বল দিন নিভে গেলে, হলে একাকার,
পৃথিবীতে নামে যেই নরম প্রাণের অন্ধকার,
তখন মনের খোলা আকাশেতে কার স্বর
উদাত্ত ভাস্বর
নিত্য অমলিন
সাইগন-বার্লিন!

আকাশের কাছাকাছি
তবু আজো কান পেতে আছি,
কোথায় শব্দের ঢেউ কাঁপে থরো থরো,
এরিয়েল উঁচু করে ধরো!
খোঁজ করো এই গ্রহ হতে গ্রহান্তরে
কোথায় শব্দের সোনা ফুল হয়ে ঝরে,
সোনার স্তবক খোলে খোলো—
এরিয়েল উঁচু ক'রে তোলো।*

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাইগন বেতারে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠ শোনা যেত।

## দিনেশ দাস

### অস্থি-চিমুর

অস্থি-চিমুর অস্থি দাও!
সারা ভারত হল উধাও
অস্থি-চিমুর অস্থি দাও!

বন্ধ্যা এ মাটি—অনুর্বর
মজ্জায় তার রক্ত পিপাসা কী বর্বর,
বারেবারে সে যে তাজা প্রাণ চায় অস্থিময়
হিরণ্ময়।

রাত্রি ঘনাল সায়াহ্নেই
মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানবের মৃত্যু নেই
বিদ্রোহী প্রাণ ছড়ায় বহ্নি অনন্তে
চেয়ে আছি তাই লাঞ্ছিত কোন্ দিগন্তে
সূর্যোদয়
স্বাধীন দিন অভ্যুদয়।

ক্লীব মৃত্তিকা ঘুমায় এখনো স্বস্তিতে
বিপ্লবী হ'ক নব-দধীচির অস্থিতে
অস্থি-চিমুর অস্থি দাও,

মধ্যভারতে সারাভারত হ'ল উধাও
হাঁকে বিহার সুগম্ভীর
হাঁকে দ্রাবিড়
মারাঠা বাংলা হ'ল অধীর
হল উধাও
অস্থি-চিমুর অস্থি দাও!

## দিনেশ দাস

### সাতারা-বিহার-মেদিনীপুর

তারে তারে আজ বাঁধা হয়ে গেছে একটি সুর
সাতারা বিহার অস্থিচিমুর মেদিনীপুর,
সাতারা আর মেদিনীপুর,
পুরানো শাখায় জীবনের রাস্তা নবাঙ্কুর।

সাতারা দুর্গ স্বপ্ন দেখেছে স্বাধীনতার
হে রাজা শিবাজী যুগাবতার
জাগো চেয়ে ভাখো রচনা সে কোন্ মহাত্মার
প্রতি গৃহ আজ হ'ল প্রাকার,
শোনো শোনো আজ নবভারতের মহাভারত
ছাড়ো ভারত!

তাম্রলিপির তমলুক আজ করে শাসন
দুঃশাসন,
বন্দরে ঘন অন্ধকার
স্বর্ণযুগের ময়ূরপঙ্খী চলে না আর
ভারতসাগরে ওঠে কলরোল ভয়ঙ্কর
বঙ্গসাগর হয় মুখর
হে সওদাগর! তিনশো সনের পুরানো বাঁধন
জীর্ণ হ'ল—
নোঙর তোলো, নোঙর তোলো!

# দিনেশ দাস

## ভারতবর্ষ

চোখভরা জল আর বুকভরা অভিমান নিয়ে
কোলের ছেলের মত তোমার কোলেই
ঘুরেফিরে আসি বার বার
হে ভারত, জননী আমার!

তোমার উৎসুক ডালে
কখন ফুটেছি কচিপাতার আড়ালে,
আমার কস্তুরী-রেণু উড়ে গেছে কত পথে
দিগন্তে আকাশে ছায়াপথে,
তবুও আমার ছায়া পড়েছে তোমার বুকে কত শত ছলে:
তুমি বাঁকা ঝিরঝিরে নদী ছলছলে
বাজাও স্নেহের ঝুমঝুমি,
জননী জন্মভূমি তুমি!

তোমার আকাশে আমি প্রথম ভোরের
পেয়েছি আলোর সাড়া,
দপদপে হীরে-শুকতারা
অস্ফুট কাকলি
জলে ফোটে হীরকের কলি
মধ্যাহ্নে হীরের রোদ—
হে ভারত, হীরক-ভারত!

কোন এক ঢেউছোঁয়া দিনে
বঙ্গোপসাগর থেকে পথ চিনে চিনে
কখন এসেছি আমি ঝিনুকের মত,
তোমার ঘাসের হ্রদে ঝিলের সবুজে
খেলা করি একা অবিরত!

আমি তো রেখেছি মুখ
তোমার গঙ্গোত্রী-স্তনে অধীর উন্মুখ,
মিটাল আত্রেয় ক্ষুধা তোমার অক্ষয় বটফলে
দিনান্তে সুডৌল জাম্বু মালাবার করোমণ্ডলে
দিয়েছে আমাকে কোল,
কত জল তরঙ্গের রাত্রি উতরোল
ভরে দিলে ঘুমের কাজলে,
মিশে গেছি শিকড়ের তন্ময়তা নিয়ে
তোমার মাটির নাড়ি হাওয়া আর জলে
গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত শরৎ—
হে ভারত, হীরক-ভারত!

আজ গৌরীশঙ্করের শিখরে শিখরে
জমে কালো মেঘ,
বৈশাখী পাখির ডানা ছড়ায় উদ্বেগ
তবু এই আকাশসমুদ্র থেকে কাল
লাফ দেবে একমুঠো হীরের সকাল
চকচকে মাছের মতন—
হে ভারত, হীরক-ভারত পুরাতন!
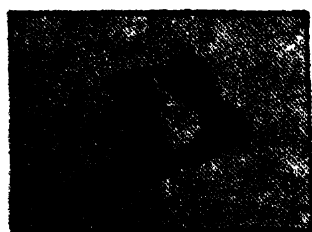
## দিনেশ দাস

### পনেরই আগস্ট, ১৯৪৭

আমার দুচোখে আজ করে ছলোছল
পদ্মার অজস্র জল
মেঘনার ডাক,
মেঘের স্রোতের মত স্তম্ভিত অবাক।

ডাক আসে ধূসর শহরে—
রুক্ষ দ্বি-প্রহরে
বাতাস ছড়ায় অবসাদ,
ছিন্নমস্তা করে শুধু রক্তের আস্বাদ।

শুকনো পাতার মত উড়ে এল স্বাধীন সনদ,
এখানে আমার চোখে ঢেউ তোলে
বুকজোড়া পদ্মা হতে দূর সিন্ধুনদ,
তবুও মুক্তির স্রোত ওঠে ফুলে ফুলে
করোমণ্ডলের ধারে শ্যাম মালাবার উপকূলে
ভারত সাগর গর্জায়,
ইতিহাসে শুরু হবে নতুন পর্যায়।

এখানে তো শাঁখের করাতে
দিনগুলো কেটে যায় করাতের দাঁতে
সীমানার দাগ দাগে জমাট রক্তের দাগ—
কালনেমী করে লঙ্কাভাগ।
তবু এল স্বাধীনতা দিন
উজ্জ্বল রঙিন
প্রাণের আবেগে অস্থির—
ডাক দেয় মাতা-পদ্মা, পিতা সিন্ধু-তীর॥

## সুশীল রায়

### দেশ-রাগ

আমার এ তৃণপ্রাণে এসে গেছে মহীরুহ-আশা
পেয়ে গেছি অনন্ত জিজ্ঞাসা।
তোমাকে চেনার চেষ্টা ক'রে তাই আমার প্রত্যহ
একে একে কেটে যায় পুলকে অসহ।
দূরবীণে যে দিক দেখি, কোন দিকে নাই কোন সীমা,
কি দিয়ে ওজন করি তোমার এ অপার মহিমা।

এই মাটি-জল এত লেগেছে যে ভালো,
সে তোমার কিছু নয়, সে আমার জীবনের আলো।
আমার সমস্ত দিক আলোকিত হয় ও-আলোয়
ছায়াময় পথ রোজ ভেসে ওঠে যেন মায়াময়।
এরা ওরা তারা যাকে বলে মিথ্যা কৃত্রিম ফানুস
সে তারা যে ধ্রুবতারা আমি তাকে চিনেছি চাক্ষুষ।
আত্মার আত্মীয় থেকে প্রিয়তর রূপে তাই তাকে
শিরায় শিরায় বেঁধে রেখেছি নিবিড় শতপাকে।

তোমাকে চিনেছে যারা কৃতার্থ হয়েছে তারা সব—
আমি তার একজন, এ আমার বিপুল গৌরব,
এ আমার নম্র অহংকার—
চোখের যে আলো দেখ, এই আলো দীপ্ত ছায়া তার।

যাদের অচেনা, তুমি তাদের আপন যতখানি
আমার আপন তত, জানি।
তবু চরিতার্থ আমি, তোমার সার্থক পরিচয়
আমার হয়েছে জানা—এ আমার জীবনের জয়।

জেনেছি জীবন নয় মায়া-মরীচিকা
কপালে এ দাগ এ যে সেই জয়টিকা।
আমার তন্ত্রীতে তাই বেজে ওঠে উল্লসিত গান
পাইনি যদিও সীমা, মহিমায় পেয়েছি সন্ধান।

তোমার জীবন যেন নদী
কোন্ দূর উৎস থেকে আমাদের জীবন অবধি
এসে গেছে ছেদহীন বেগে,
সেই জলকল্লোলে যে আমরা উঠেছি জেগে জেগে
প্রাণের নিভৃতে পেয়ে গেছি তার স্রোত।
সূর্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জ্বলে তাই উঠেছি খদ্যোত।

স্থিরলক্ষ্য হয়ে আছে, দূর থেকে নতুন সংকেতে
দিগন্তের অভিমুখে দাও নিত্য পথ পেতে পেতে।
সেই পথে চ'লে, চেনা হয় রোজ অচেনা অঙ্গন
হঠাৎ-খুশিতে ভরে উঠে সারা মন।
সীমা নেই, শেষ নেই, সাঙ্গ তাই হয় না সন্ধান
ফুরায় না কথা তাই, ফুরায় না তাই আর গান।

## মণীন্দ্র রায়

### স্বদেশ

ম্রিয়মাণ হৃতশক্তি হে স্বদেশ
প্রণাম। শতাব্দী শেষ
বিহ্বল দিগন্ত পারে, স্থাণু জনতার
স্নায়ুজালে—ধমনীর লোহিত বিস্ময়ে জাগে স্তম্ভিত মাটির
দলিত নিরুদ্ধ স্বাধিকার।

দম্ভের প্রাসাদচূড়া হ'তে
নিষ্পিষ্টের বঞ্চিতের পুঞ্জীভূত বেদনার স্রোতে
যাহারা দেখেছে শ্লেষে মেখলার প্রায়
পিশাচ বাতাসে ঘোরে সে-কলঙ্ক করুণ অধ্যায়

স্বর্ণরশ্মি দিবসের উচ্চকিত গতি
মর্মরিত জনারণ্যে আনে আজ সবুজ উল্লাস।
যুগান্ত-তোরণ-পথে জয়যাত্রা। শ্লথ পাশ
জীবনের, জড়তার।
হে স্বদেশ, প্রণাম আমার॥
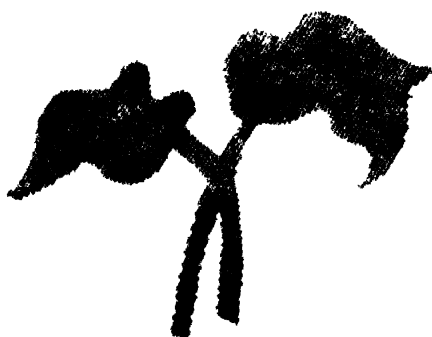
## সুভাষ মুখোপাধ্যায়

### জননী জন্মভূমি

আমি ভীষণ ভালবাসতাম আমার মা-কে
—কখনও মুখ ফুটে বলি নি।
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু
—শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভ'রে উঠত
আমার ভালবাসার
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

হে দেশ, হে আমার জননী—
কেমন ক'রে তোমায় আমি বলি!

যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি—
আমার দু-হাতের
দশ আঙুলে
তার স্মৃতি।

আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই,
হে জননী,
তুমি॥
আমার হৃদয়বীণা
তোমারই হাতে বাজে।

হে জননী,
আমি ভয় পাই নি।
যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে
আমরা তাদের ঘাড় ধরে
সীমান্ত পার ক'রে দেব।

আমরা জীবনকে নিজের মতো ক'রে
সাজাচ্ছিলাম—
আমরা সাজাতে থাকব।

হে জননী,
আমরা ভয় পাই নি।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে ব'লে
আমরা বিরক্ত।

মুখ বন্ধ ক'রে,
অক্লান্ত হাতে
হে জননী,
আমরা ভালবাসার কথা ব'লে যাব॥

## বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### স্বদেশ আমার

স্বদেশ আমার, তোকে নিয়ে স্বপ্ন এখন
যেন সোনার পাথরবাটি। বাটির মধ্যে
চাঁদকপালে শিশুর রক্ত!

স্বপ্নও আজ ধাঁধার মতো, স্বদেশ!
তুই যেন এক মস্ত নদী, ভেতরটা যার পাথর।

চোখের জলে আগুন লাগে, অথচ কিছুই হয় না—
শুধু জল আর পাথর, পাথর যেন আগুন!

আজ স্বপ্ন আমার অন্ধের পথহাঁটা, সামনে
পাতাল-রেলের গর্ত খুঁড়ছে
রাত্রি—তার শরীর জুড়ে ঘুম।

## বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### অথচ ভারতবর্ষ তাদের

কোথায় তাদের ঘর? ত্রিপুরায়, আসামে, বাংলায়
সাঁওতাল পরগণায়, দাক্ষিণাত্যে মেঘালয়ে

ঘর কোথায়? পাহাড়ে, জঙ্গলে, চা-বাগানে কয়লা-খনিতে
তারা হাঁটে, কুঁজো হয়ে কাজ করে, আধপেটা খায়, বিনা চিকিৎসায় মরে।
কিংবা কপালের জোরে বেঁচে থাকে
কোথায় তাদের মান? দেশ থাকতে দেশ নেই, পথের ঠিকানা নেই
অথচ ভারতবর্ষ তাদের রক্ত ও হাড়—তারাই গড়েছে এই মহাদেশ
শত শতাব্দীর শ্রমে, পরিচ্ছন্ন সভ্যতায়, মানবিক শুভেচ্ছায়-বোধে!

# বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## আমার ভারতবর্ষ

আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের
যারা সারা দিন রৌদ্রে খাটে, সারা রাত ঘুমুতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায় শীতে ;

কত রাজা আসে যায় ইতিহাসে, ঈর্ষা আর দ্বেষ
আকাশ বিষাক্ত করে
জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াশায়
ক্রমে অন্ধকার হয়
চারদিকে ষড়যন্ত্র, চারদিকে লোভীর প্রলাপ
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে
মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে, বাঘের থাবায় ;

আমার ভারতবর্ষ চেনে না তাদের—
মানে না তাদের পরোয়ানা ;
তার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে চারদিকের
প্রচণ্ড মারের মধ্যে
আজো ঈশ্বরের শিশু, পরস্পরের সহোদর ॥
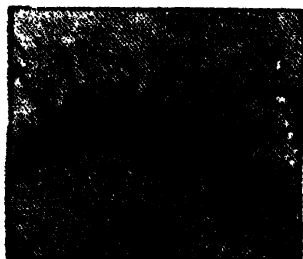
## বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### জননী জন্মভূমিশ্চ

১

যিনি চলে গেলেন
তাঁকে ম্লান মুখেই চলে যেতে দিয়েছি;
সেজন্য আমার ভিতর কি
কোন গভীর বেদনা আছে?

মানুষ নামের এক রকম পাথর,
তাতে আলো পড়ে না
অন্ধকার নড়ে না
কিছুই না...

মাঝে মাঝেই মনে হয়
আয়নার সামনে কেউ দাঁড়ালে
শুধু আয়নাটাই কথা বলে।
কী যে বলে, তা শুনবার মানুষ
আজ আর আমি খুঁজে পাই না।

২

আমার জন্মভূমি,
আমি অনেকদিন তাঁকে দেখি না
তাঁর কোনো খবর রাখি না।
তিনি কি এখনও কুয়াশায় কাঁথামুড়ি দিয়ে
আগের মতোই নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে আছেন?

আমার ছেলেবেলায়
যেমন তাঁকে দেখেছিলাম,
শীর্ণ দুটি হাত ঘুমের ভেতর কেঁপে কেঁপে উঠছে!

নাকি অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গেছে
পাখি ডেকেছে, ফুল ফুটেছে।
তারপর বাঘের মতো এক দুপুর এসে আমার মায়ের
পাড়া-জ্বালানো ছোট ছেলেটাকে···

তার কোনো চিহ্নই আর পাওয়া গেল না,
নদীর এপারে না
ওপারে না।

হয়তো সে আমার নিজের ভাই ছিল না,
কিন্তু তাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।
চারদিকে এখন কত ফুল, কত পাখি···
হয়তো এভাবেই একদিন দুপুর গড়িয়ে
বিকেল আসে!

তারপর সন্ধ্যা নামবে, রাত গভীর হবে—
আমি তখন পাথরের মতো ঘুমুবো।

## বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

### মানুষ কেন বেঁচে থাকে

আমরা যখন শিশু, তখন তিনি পরাধীন ভারতবর্ষকে
স্বাধীন দেখার প্রতিজ্ঞায় জ্বলছেন।
আমরা যখন যুবক, তখন তিনি কখনো
কারাগারে, কখনো রাস্তায় মিছিলে
অথবা কোনো গুপ্তসমিতির সভায়
সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপ্ন দেখছেন।

দেশ স্বাধীন হলো। তিনি আজীবন সংগ্রামী,
কিন্তু এই স্বাধীনতায় তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ
ভূমিকা রইল না।
আমাদের চোখের সামনে তখন জ্বলজ্বল করছে
ভারতবর্ষের বিখ্যাত তারকারা—নেহরু, প্যাটেল, আজাদ,
রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারিয়া…

প্রায় বিনাযুদ্ধে দেশ স্বাধীন হলো—তবে
তিনি যেরকম চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে নয়।
দেশ তিনখণ্ড হয়ে গেল, ভারতবর্ষ
নামের আর কোনো চিহ্ন রইল না!
তিনি তখন সেই স্বাধীন ভারতের নাগরিক, যার
পশ্চিমে নিষেধের কাঁটাতার, পুবে…

তিনি ভারতবাসী, কিন্তু ভাষার দিক থেকে
আমার মতই বাঙালী।

তাঁর চোখের সামনে সোনার বাংলা ভাগ হয়ে গেল।
আমাদের সর্বভারতীয় নেতারা
প্রায় খুশিমনেই এই ভাগ মেনে নিলেন।

দ্বিখণ্ডিত বাংলাদেশ, অথচ মুখের ভাষা একটিই
তা বাংলা ভাষা।
তবু এক বাংলা থেকে অন্য বাংলায় যেতে এখন
পাশপোর্ট দরকার হয়, ভিসা লাগে।
স্বাধীনতার গলায় কখনো কেউ কাঁটা ফুটতে দেখেছেন?
হয়তো সে রকম কিছু ঘটে নি কিন্তু তাঁর
গলার ভিতর তখন থেকেই কীরকম একটা বেদনা!

দেশ স্বাধীন হবার পাঁচ বছর পর তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম:
'বলুন তো, এই দেশের কী ভবিষ্যৎ?'
গলার কাঁটাটা ততদিনে হয়তো তাঁর সহ্য হয়ে গেছে;
তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: 'আমরা এখন স্বাধীন।
সেদিক থেকে বলতে পারো
আমাদের ভবিষ্যৎ শুভ, কেননা তা আমরা
নিজেরাই নির্মাণ করবো।'
দশ বছর পরে তাঁকে একই প্রশ্ন করেছিলাম,
তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: 'আমাদের জীবনে
তেমন কিছু ভাল দেখে যেতে পারবো,
মনে হয় না। ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে,
গরীবরা উপোস করছে...'

'তা হলে?'
'পরিবর্তন কিছু হবেই। হয়তো আমাদের
নাতি-নাতনীরা সেই সুখের ভাগ পাবে।'

মাঝখানে আরো বহু বছর কেটে গেছে। ইচ্ছে করেই
দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে
আমাদের ভিতর আর কোনো কথা হয় নি।
তবে তাঁর ভিতরে কোথাও একটা ছটফটানি
আমি অনুভব করেছি।
কারণ আদর্শ ও বিশ্বাসের দিক থেকে আমি
ছিলাম তাঁর খুবই কাছের।
আজ হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা, আমি অসুস্থ
জেনে দেখতে এসেছেন।
নানা কথার ফাঁকে হঠাৎ আমার কী মনে হলো,
আগের মতই প্রশ্ন করলাম: 'কেমন বুঝছেন,
আমাদের ভবিষ্যৎ?'
এক মুহূর্ত না ভেবে, বিনা দ্বিধায় তিনি যেন
চিৎকার করেই বলে উঠলেন:
'কোন ভবিষ্যৎ নেই।'
'আমাদের নাতি-নাতনীদের?'
'যেভাবে আমরা চলেছি, তাতে আমি কারও
সম্পর্কেই আশাবাদী নই।'
'দেখেছেন ওরা শিশুকাল থেকেই কেমন
চটপটে আর বুদ্ধিমান?'
'সবই চোখে পড়ে। কিন্তু মনে রেখো,
ওদের শত্রুরাও সজাগ।'
'আপনি কাদের কথা বলছেন?'
'যারা গায়ের জোরে এই দেশের মালিক, আর যারা
দেশটাকে আরো টুকরো-টুকরো করে দিতে চায়।

যারা পার্লামেন্টকে করেছে নিজেদের সখের জমিদারী
আর যারা মন্ত্রীদের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে
বেবীফুডেও ভেজাল মেশায় আর
সমানে মুনাফা লোটে।'

'আপনি বলছেন এসব দিনে-দিনে বাড়বে?
কোনো শুভবুদ্ধির উদয় হবে না?'
'তুমি বলেছো হবে? এসব দেখে শুনেও?
এই যে আমরা বেঁচে আছি, এর কোনো সত্যিকারের মানে আছে—
তুমি তাই বলতে চাও?'

'তাই তো বলতে চাই।'—
আমি চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধ, আমার হাত ধরে
পঁচাত্তর বছরের তিনি
হঠাৎ যেন কবেকার দেখা সেই যুবকটি
হয়ে গেলেন।
বললেন: 'তাই যেন হয়। আমার হিসেবে কোথাও
একটা প্রকাণ্ড ভুল থেকে যাক্—
নিশ্চয়ই আমাদের বেঁচে থাকার একটা মানে আছে।'

বৃদ্ধ চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর কথাগুলি ঘুরে ফিরেই
আমার বুকের ভিতর ধাক্কা দিতে লাগলো।
আমার ভাবনাগুলি একসময় নিজেদের ছাড়িয়ে, পুত্র-কন্যাদের ছাড়িয়ে
আমাদের নাতি-নাতনীদের দিকে চলে গেল।
এ কী হতে পারে, তাদের পৃথিবী হবে একটা দুষ্ট ক্ষতের মতো
যে যন্ত্রণা থেকে কোনোদিনই তাদের মুক্তি নেই?
'ওঁর হিসেবে নিশ্চয় কোথাও একটা মস্ত ভুল আছে'—
প্রায় চিৎকার করেই নিজেকে আমি বললাম:
'আমাদের পৃথিবী মানুষের পৃথিবী, আর কোথাও
মানুষের শুভবুদ্ধি থেকেই যায়'

এই দুঃখের দিনেরও একদিন অবসান হবে
আমাদের নরকবাসের অভিজ্ঞতাই বাঁচাবে আমাদের
সন্তানসন্ততিদের।
অথবা তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু সেই ধ্বংসের
পরে আসবে নতুন দিন।

এটাই আমার হিসেব। আর এই হিসেবই আমাকে বললো:
'রোগ যতই কঠিন হোক, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ্।
যে আগুন এখন নিবু-নিবু
তাকে যেভাবেই হোক জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
সেটাই হবে এখন তোদের সবচেয়ে বড় কাজ।

তোরা, যারা একদিন স্বপ্ন দেখেছিলি সত্যিকারের
স্বাধীনতার
যেখানে মানুষ মানুষের জন্যই বেঁচে থাকে।'
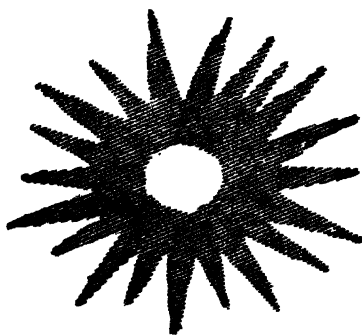
# মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

## জননী যন্ত্রণা

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল দুকূল মজা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজাল ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে—সে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ার হা হা হা হা
পাহাড় থমকে পাথর, নদীর পা টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখে অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পড়ে মূর্চ্ছা বোনঃ ডাঙা।
ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর যা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মত এক কোণে বউ, দুয়ারে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।
এক যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে ছেলের, মা
ঘর যে তোমার ঘরে ঘরে জননী যন্ত্রণা।

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল দুকূল মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলাফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি—কান্না আমার নয়।
কালি ঢালা নদী, বাঁকে ও কার নৌকা, আলো
নেই-মনিষ্যি তেপান্তর পথ চিনে কে যায়?
সে আমি সেই আমরা—আমরা কে মন্দ কে ভালো
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ বা কলে-কারখানায়।

একটি তারা-পিদিম কখন হাজার তারা জ্বালে:
এক ছেলেকে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জনা
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে:
এক নামে যেই ডাকলে—অনেক হলাম যে একজনা।
ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।

## নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

### নিজের মা

এখনও তোমরা অন্ধকারে বসে আছ কেন?
এখনও তোমরা নিচু গলায় কথা বলছ কেন?
এসো, তোমরা এই রোদ্দুরে এসে দাঁড়াও।
নিজের মাকে একবার মা বলে ডাকো।

কেন না, তোমাদেরও
আয়নায় মুখ দেখতে হয়।
কেন না, তোমাদেরও
স্পষ্ট চোখে
নিজের চোখের দিকে তাকাতে হয়।

তা হলে তোমরা অন্ধকারে বসে আছ কেন?
তা হলে তোমরা নিচু গলায় কথা বলছ কেন?
এসো, তোমরা এই পথের উপর এসে দাঁড়াও
এসো, তোমরা এই রোদ্দুরে এসে দাঁড়াও
এসো, তোমরা এই হাওয়াকে একবার
ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে বলে ওঠো—
মা আমার! মা আমার!

## নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

### মাটি ও মানুষে মূর্ত

জন্মেছি যেখানে, যেন স্বর্গাদপি তাকে প্রিয়তর
বলে বুঝতে পারি, যেন আর্তকে ঈশ্বর
বলে মানি।
যেন জানি,
যার জন্যে এত আর্তি, যার জন্যে এত হাহাকার,
মাটি ও মানুষে মূর্ত—তা-ই রয়েছে সম্মুখে আমার।

## জগন্নাথ চক্রবর্তী

### পার্কস্ট্রিটের স্ট্যাচু

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে কে যেন ডাকল
আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম : 'কোথায় যাচ্ছ ?'
কিন্তু কাউকে দেখলাম না !

খুব জোরে ব্রেক কষলাম,
জুতোটা একটু ঘষলাম ক্লাচের ওপর—
না কোথাও কেউ নেই।
আয়নার ভেতর পেছনে শেক্‌সপিঅর সরণি পর্যন্ত
পিচের রেখা ছাড়া কিচ্ছু নেই।
কিন্তু সিট ছেড়ে নেমে এলাম না,
আবার ধীরে ধীরে গিআর চড়ালাম।
কাউকে দেখলাম না,
শুধু নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'কোথায় যাচ্ছি ?'

জাদুঘরের সামনে কি যেন অসাড়
রাস্তা রোধ ক'রে পড়ে আছে।
আবার খুব জোরে ব্রেক কষলাম, পাছে—
না, তা নয়, দেওদারের দীর্ঘ ছায়া।
আবার যেন কে ডাকল,
আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম : 'কোথায় যাচ্ছ ?'

এবার স্পীড বাড়ালাম
যতক্ষণ না অপস্রিয়মান দুধার
ঝাপসা হতে হতে একেবারে ঘষা কাচ হয়ে গেল।
তারপর সেই ডাক আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল সারাদিন
পার্কস্ট্রিট থেকে স্ট্র্যাণ্ড, স্ট্র্যাণ্ড থেকে বজবজ,

আবার স্ট্যাণ্ড, আবার এসপ্ল্যানেড, আবার জাদুঘর,
আবার খুব জোরে ব্রেক কষলাম।
কে যেন ডাকল।
'কে?' নিজের মনেই চিত্‌কার করে উঠলাম।
কেউ না।
স্টার্ট দিতে যাব এমন সময় দেখি—
এক বৃদ্ধ, খালি পা, হাতে একটা লাঠি,
ঠিক পার্কস্ট্রিটের মাথায় স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে।

তারপর সারা বাংলাদেশ, সারা ভারতবর্ষ,
নোয়াখালি থেকে সবরমতী,
গাড়িতে, ট্রেনে, এরোপ্লেনে ছুটে বেড়িয়েছি,
আর ঐ স্ট্যাচুর মতো লোকটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে
আমার স্পিডোমিটারকে লজ্জা দিয়েছে,
তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে পথ থেকে পথে
পার্কস্ট্রিট থেকে, বজবজ থেকে, কলকাতা থেকে, দিল্লি থেকে,
কাজে-অকাজে, ন্যায়-অন্যায়, নিয়ম-অনিয়মের এবড়ো খেবড়ো পথে
ছুটতে ছুটতে কেবলই শুনছি: 'কোথায় যাচ্ছ?'
আর কেবলই ব্রেক কষছি।
সেই বৃদ্ধ, খালি পা, হাতে একটা লাঠি,
সর্বত্র স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে।

সত্যিই, কোথায় যাচ্ছি?
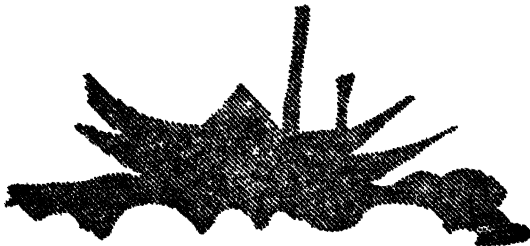
## রাম বসু

### স্বদেশ

নিহত পুষ্প আর প্রত্যয়ের ধারে
শিকড় আর জলার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের কিনারে
আমি নীল স্তব্ধতায় নিবেদিত পাথর খণ্ড
চাই তোমার শস্য কাদার অন্ধকার ঘ্রাণ
তোমার দেহের মাধুর্যের ঊর্মিল উল্লাস

সময়ের এই নৃশংস নরকেও আমার হৃদয়
পাখির ডানার নিচে রূপময় প্রেমের নিসর্গ
আমি স্বস্তির মতো মেলাতে পারি আলো অন্ধকার
দুই বিপরীতের টানে আমার দেহ সুরবাঁধা বীণা

আমি কণ্ঠে ধারণ করেছি যন্ত্রণার উজ্জ্বল বিহঙ্গ
তার অস্থির পাখার হাওয়ায় প্রসারিত দৃষ্টির বলয়
কাঁটা ঝোপ মাথায় নিয়ে দৈত্যের মতো মাথা তোলে নদী
আর আমার কামনা মহাজাগতিক নৃত্যের মৃদঙ্গ

তুমি, আমার থ্যাতলানো গোলাপকুঁড়ি
তুমি, আমার রুদ্ধবাক স্বপ্ন ও ভর্ৎসনা, তুমি
যে দেখেছো ছাল চামড়া তোলা জীবনের রূপ
উদ্ভাসিত করো তবে তোমার বুকের স্থিরকেন্দ্র পথ
যেন আমি হয়ে যাই ঘুমন্ত শিশুর স্বপ্নস্বর

স্বদেশ, আমার পুরুষার্থ, আত্মার দর্পণ
নিজের ছায়াকে ছড়িয়ে দিয়েছি ঘৃণা আর শোষণের সীমানা পেরিয়ে
ফিরে পাবো বলে মানুষের মহিমার মুখ, ধারাবাহিকতা
স্বদেশ আমার, তোমার পায়ের নীল নৈঃশব্দ্যে আমি
নিবেদিত পাথরখণ্ড।

## সুকান্ত ভট্টাচার্য

### সিপাহী বিদ্রোহ

হঠাৎ দেশে উঠল আওয়াজ—'হো-হো, হো-হো, হো-হো'
চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে—সিপাহী বিদ্রোহ!
আগুন হয়ে সারা দেশটা ফেটে পড়ল রাগে,
ছেলে বুড়ো জেগে উঠল নব্বই সন আগে;
একশো বছর গোলামিতে সবাই তখন ক্ষিপ্ত,
বিদেশীদের রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত!
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মী—
সবার হাতে অস্ত্র, নাচে বনের পশু-পক্ষী।
কেবল ধনী, জমিদার আর আগের রাজার ভক্ত
যোগ দিল, তা নয়কো, দিল গরীবেরাও রক্ত!
সবাই জীবন তুচ্ছ করে, মুসলমান ও হিন্দু,
সবাই দিতে রাজি তাদের প্রতি রক্তবিন্দু;
ইতিহাসের পাতায় তোমরা পড় কেবল মিথ্যে,
বিদেশীরা ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে।
অত্যাচারী নয়কো তারা, অত্যাচারীর মুণ্ড
চেয়েছিল ফেলতে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড।
নানা জাতের নানান সেপাই গরীব এবং মূর্খ:
সবাই তারা বুঝেছিল অধীনতার দুঃখ;
তাই তো তারা স্বাধীনতার প্রথম লড়াই লড়তে
এগিয়েছিল, এগিয়েছিল মরণ-বরণ করতে!

আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা
উঠছে বেজে, কোনোদিকেই নেইকো কোনো শঙ্কা;
জব্বলপুরে সেপাইদেরও উঠছে বেজে বাদ্য
নতুন ক'রে বিদ্রোহ আজ; কেউ নয়কো বাধ্য,
তখন এঁদের স্মরণ করো, স্মরণ করো নিত্য—
এঁদের নামে, এঁদের পণে শাণিয়ে তোলো চিত্ত।
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মী—
এঁদের নামে, দৃপ্ত কিশোর, খুলবে তোমার চোখ কি?

## সুকান্ত ভট্টাচার্য

### মহাত্মাজীর প্রতি

চল্লিশ কোটি জনতার জানি আমিও যে একজন,
হঠাৎ ঘোষণা শুনেছি: আমার জীবনে শুভক্ষণ
এসেছে; তখনি মুছে গেছে ভীরু চিন্তার হিজিবিজি
রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী!
এখানে আমরা লড়েছি, মরেছি, করেছি অঙ্গীকার,
এ মৃতদেহের বাধা ঠেলে হব অজেয় রাজ্য পার।
এসেছে বন্যা, এসেছে মৃত্যু, পরে যুদ্ধের ঝড়,
মন্বন্তর রেখে গেছে তার পথে পথে স্বাক্ষর;
প্রতি মুহূর্তে বুঝেছি এবার মুছে নেবে ইতিহাস—
তবু উদ্দাম, মৃত্যু-আহত ফেলেনি দীর্ঘশ্বাস:
নগর গ্রামের শ্মশানে শ্মশানে নিহিত অভিজ্ঞান:
বহু মৃত্যুর মুখোমুখি দৃঢ় করেছি জয়ের ধ্যান।
তাই তো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।
দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,
তাইতো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ॥
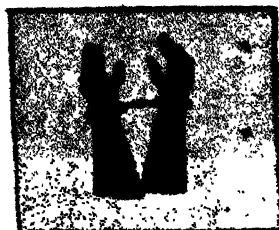
## কৃষ্ণ ধর

### প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

মানচিত্রের রেখায় নয়, অদৃশ্য কালিতে লেখা
তার সাম্রাজ্য সীমানা
অস্থিমজ্জার ভিতরে, শিরায় শিরায়, চেতনে
অবচেতনে, স্মৃতিসত্তায়
প্রচ্ছন্ন স্বদেশ।
আজন্ম তার ধুলো মাটি আঁকড়ে
ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে, শিকড়ে
পুণ্য জলধারা খুঁজে, উৎসে ফিরে গিয়ে
প্রচ্ছন্ন স্বদেশ জেগে থাকে
অস্তিত্বে, বোধে, স্বপ্নে ও বাস্তবে
শুধু ছাড়পত্র পরিচয়ে নয়
বুকের ভিতরে, গভীরে, রক্তকণিকায়
ভালবাসা ও ঘৃণায়, প্রাকৃত সত্তায়
সংবিধান সংশোধনে নয়।
বুকের ঘাসের শীষে রাঙা প্রজাপতির ডানায়
কাঁটাতারের বেড়ায় সীমান্তের নিঃসঙ্গ পোড়োবাড়ির
ভাঙা দরজার গায়ে, কুলুঙ্গিতে, হুতোমের
প্রগাঢ় ডানায়, আমাদের কৃতকর্মে
সময়ের বিষণ্ন দুন্দুভি বেজে বেজে
ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকে নির্জন অলিন্দে।
ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায় ঢাকা দগদগে ক্ষত
নিরাময় আশা কি দুরাশা
তারই জন্য পথচলা, জেগে থাকা, নদীর উজানে যাওয়া
সর্বস্ব অর্পণ করে স্বপ্ন দেখা।

মানচিত্রে নয়, বুকের গভীরে শুয়ে আছে
আবহমানের পাশে একা একা,
সময়ের হৃদয়ে আমূল প্রোথিত করে, অস্থিমজ্জায় মিশে
বিস্মৃতির অন্ধকারে, স্মৃতির উষায়
অভিমানী প্রচ্ছন্ন স্বদেশ।

অমিতাভ চৌধুরী

**বন্দে মাতরম্**

গান্ধীবাবা দিলেন ডাক
মানুষ জড় লাখে লাখ।
বলো—'বন্দে মাতরম্,'
ইংরেজের মাথা গরম।
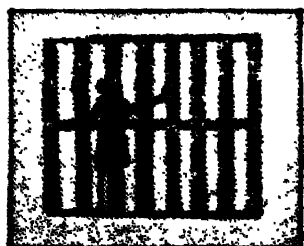
## শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

### কোথাও যাব না

কাল সারাদিন বৃষ্টির পর আজকে একটু ফর্সা হয়েছে—
ভুলো-চাপা চোখ ফোড়া-কাটা রোদ
উশখুশ করে সকাল থেকেই।
এপাশ ফিরছে ওপাশ ফিরছে—
আজও কেউ ওকে উঠতে দেবে না? ভারি অন্যায়:

সকাল থেকেই এ কি ঝোড়ো হাওয়া উথাল-পাথাল
তাল নারকেল হেসে লুটোপুটি
একদল মেয়ে ঝাউগাছ সেজে গ্রামে যাচ্ছিল
থমকে দাঁড়িয়ে এখন কী করি
ভাবছে, কিন্তু বাড়ি ফিরবার কোনো তাড়া নেই,
একি ঝোড়ো হাওয়া লজ্জা-শরম
বুঝি উড়ে যায়।
কৃষ্ণচূড়ার দেহ থেকে ঝরে আবিরের মত
হলুদের গুঁড়ো
পথ ভরে যায়।
পাখিদের মনে ফুর্তি অথচ চোখে ভয়, পাছে
হাওয়ার ঝাপটে ভেঙে যায় ডানা;
রোদে পোড়া নেই
জলে ভেজা নেই
শুধু একা চিল টাল খেতে খেতে মেঘলা দিনের
বাতাস লুটছে···
দেখছে নিম্নে সারি সারি লোক
আলপথ বেয়ে মাথায় বোঁচকা
আজ হাট-বার।

দেখছে, ওদিকে সাজো-সাজো রব
মেঘমণ্ডলের রাজধানী ওটা?
অশ্ব ও রথ, হস্তী সেনানী, উড্ডীন কার দীর্ঘ পতাকা?
দল বেঁধে ওরা চলেছে কোথায়
কোন্ অভিযানে?

শ্রাবণ শেষের এই সব খেলা
দেখতে আমার টিকিট লাগে না
ছুটে গিয়ে সীট ধরতে হয় না ভিড় সাঁতরিয়ে।
মেঘলা সকালে
জানলাটা শুধু অর্ধেক খুলে চুপ করে বসি,
চশমা রেখে দি,
টিনের বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে জানাই: তোরা শুরু কর।
অমনি সূর্য আড়মোড়া ভাঙে, ছুটে আসে হাওয়া
গাছেরা পাখিরা, মেঘেরা নিখুঁত স্বতঃস্ফূর্ত
অভিনয় করে—
আমার সামনে। আমাকে দেখায়। হাততালি চায়।
জীবনের রস চাখতে মানুষ হন্যের মত কোথায় না ঘোরে···
ক্যালিফোর্ণিয়া, টোকিও, মস্কো
প্যারিস, ভিয়েনা···
আমি বেশ আছি
খুব ছোট ঘর, জানলাও ছোট, কিন্তু আমার
সামনে জীবন কী উন্মাদনা মেলেই চলেছে
আমার স্বদেশ কী বৈচিত্র্য বিলিয়ে চলেছে
প্রতিদিন। কেউ খবর রাখো কি?
এ কুটির ছেড়ে কোনোদিন আমি কোথাও যাবো না।

## শঙ্খ ঘোষ

### স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে

তুমি মাটি? কিংবা তুমি আমারই স্মৃতির ধূপে ধূপে
কেবল ছড়াও মৃদু গন্ধ আর কিছু নও?
রেখায় রেখায় লুপ্ত মানচিত্র-খণ্ডে চুপি চুপি—
তোমার সত্তাই শুধু অতীতের উদ্দাম উধাও
বাল্যসহচর! তুমি মাটি নও দেশ নও তুমি।

নদী তুমি? যে তোমারই শৈবালের আচ্ছাদনে ঢাকা
বেদনার ধারা চলে আসমুদ্র হিমাচল ক্ষীণ—
আমার হৃদয় তার দ্বীপে দ্বীপে পুঞ্জ করে তাকে
খালে বিলে ঘাসে ঘাসে লেখা সেই বিদায়ের গান,
বেদনার সঙ্গী, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।

তুমি দেশ? তুমিই অপাপবিদ্ধ স্বর্গাদপি বড়ো?
জন্মদিন মৃত্যুদিন জীবনের প্রতিদিন বকে
বরাভয় হাতে তোলে দীর্ঘকায় শ্যাম ছায়া-তরু
সেই তুমি? সেই তুমি বিষাদের স্মৃতি নিয়ে সুখী
মানচিত্র রেখা, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।

## শঙ্খ ঘোষ

### দেশ আমাদের আজও কোনো

জঙ্গলের মাঝখানে কাটা হাত আর্তনাদ করে
গারো পাহাড়ের গায়ে কাটা হাত আর্তনাদ করে
সিন্ধুর স্রোতের দিকে কাটা হাত আর্তনাদ করে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর
সমুদ্রে গিয়েছে তার ঢেউয়ের মাথার থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
চূড়া বা গম্বুজ থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
আলের ভিতর থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
তোমার চোখের সামনে লাফ দিয়ে আর্তনাদ করে
সমবেত স্বর থেকে সব ধ্বনি মেলানো অকালে
কণ্ঠহীন সমবেত স্বর
খড় খুঁজে আর্তনাদ করে
হৃৎপিণ্ড চায় তারা শূন্যের ভিতরে থাবা দিয়ে
ধ্বংস প্রতিভার নাচে আঙুলের কাছে এসে আঙুলেরা আর্তনাদ করে

জলের ভিতরে কিংবা হিমদাহ চূড়ার উপরে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর
অর্থহীন শব্দগুলি আর্তনাদ করে আর তুমি তাই স্তব্ধ হয়ে শোনো

দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের কোন মাতৃভাষা দেয়নি এখনো!

# অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

## ভারতবর্ষকে নিয়ে

১. শিবালিক গিরিমালা

তিতির শিকার ক'রে অন্ত্যাজ নিষাদরুদ্র যায়।

তিন যুগ পরে দেখা, প্রথমে তো চিনতেই পারি নি,
তাছাড়া আরেক ভোল, ডান হাতে ইস্পাতের বালা.
যাকে সে করেছে খুন তার কাছে রয়েছে আ-ঋণী—
মৃত তিতিরের মুখে মেলে ধরে নৈবেদ্য নিরালা;
তাকে তিরস্কার করে সূর্যাস্তের রাগতরঙ্গিণী

সহসা নিষাদরুদ্র নুয়ে পড়ে নমঃশূদ্রতায়!

২. লছমনঝুলায়

খুব ভালো হয়েছে এই যে আকাশের গাঁথনিও এখন তলিয়ে যাচ্ছে আর চৌদিকের চোরা অন্তরীক্ষ থেকে ঢুকে পড়ছে বেনো জল; একটু আগেই যে-প্রেমিক লছমনঝুলা পার হচ্ছিল তাকে সর্বস্বান্ত করে অলকা--নন্দায় ফেলে দিতে গিয়ে পাণ্ডারা চমকে এ ওর দিকে তাকালো—পড়ন্ত আকাশ তার শিথিল ভিত্তি নিয়ে তাদের মাথার উপর নেমে আসছে।
আর সেই হৃতরিক্ত প্রেমিক তার উদ্বৃত্ত ধরিত্রীটুকু
নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াবে
সেইখানে ভর রেখে আকাশ তার টলে-যাওয়া
ভিত্তি নিয়েও বিশ্রাম নিতে
পারবে এখনো আরো কিছুদিন অন্তত

৩. হরিদ্বারের পথে

তোমাকে বলেছি তুমিও শুনেছো
য়্যুক্যালিপ্‌টাস্‌ পথের শিখানে,
'ওরা অবুঝ' ব'লে বাতিদানে

নতুন প্রতীতি জেলে দিয়ে প্রিয়
ভরে দিলে গান অগীতবিতানে

'ড্রাইভার ফেরো, গুনে নিতে হবে
এ পরিসংখ্যা কতোটা অজেয়'
এই ব'লে আমি বক্সোৎসবে
নেমে যাই, এই সংশয় সে-ও
দ্বিতীয় প্রতীতি জেলে ধরে নভে ॥

৪. জুবিন মেহ্তা

আমিও টিকিট পাইনি। তবে অবক্ষয়
মেনে নেবো? সে-আঙ্গিকও মূঢ় মনে হয়।
বরঞ্চ দেখতে পাই এই প্রত্যাখ্যানে
দারুণ-আনন্দ এক, আজ কে না জানে
কারো-না-কারোর কাছে ঠিক তোলা আছে
হ্বাগনারের 'পার্সিভাল'; ইমনকল্যাণে
ভর দিয়ে অমনি যাই উত্তাল স্বরাজে
প্রকাশ আপ্তে-র বাড়ি, চোদ্দ পায়ে হেঁটে
সাতজন, শুনলাম সংবৃত ক্যাসেটে
ঐকতান।
    আর তুমি? বলো কি পেলে তা
প্রেক্ষাঘরে, অন্তরীণ, জুবিন মেহ্তা?

৫. অমৃতসর

গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে।
অনেকদিন সকালবেলায়
পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে
সেই সরোবরের মাঝখানে

শিখমন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই
ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা
সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে
বসিয়া সহসা এক সময়
সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন—

বিদেশীর মুখে তাহাদের এই
বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা
উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া
তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময়
মিছরির খণ্ড আর হালুয়া লইয়া আসিতেন।

স্বর্ণমন্দিরের চূড়া জীবনস্মৃতি-র গায়ে লেগে

স্বপ্নের ভিতরে আমি জেগে
একপাশে জল রেখে এক টুকরো চিনি
ছুঁড়ে ফেলে ছুরি দিয়ে জল নিয়ে করি ছিনিমিনি—
তুমি কি আমার ধর্ম নেবে, নারী, তোমারও শরীরে
দেবো এই জল। ভাই, তুমি কি আমার ধর্ম নেবে,
তাহলে আমার সঙ্গে এসো এই কনকমন্দিরে,
আমরা একসঙ্গে রাখবো ওষ্ঠাধর গ্রন্থসাহেবে,
সমস্ত বিভক্ত জল একাকার করে দেবো বেঁটে;
দেখিনি এমন খড়্গ জলকেও দিতে পারে কেটে,
কবিবন্ধুদের মধ্যে অমৃতসমুদ্র সঙ্গোপনে
দুলে ওঠে কম্বুগ্রীব হয়ে যায়, যে-নীল তোরণে

[illegible]

## পূর্ণেন্দু পত্রী

### হে স্তন্যদায়িনী

তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন?
তোমার দুধের মধ্যে এত ঘন বিশৃঙ্খলা কেন?

রক্তে ঘরে না ভেজালে
কোনো সুখ দরজা খোলে না।
ময়ূরও নাচে না তাকে দু-নম্বরী সেলামী না দিলে।
হাতুড়ির ঘায়ে না ফাটালে
রাজার ভাঁড়ার থেকে একমুঠো খুদ খেতে
পায় না চড়ুই।
স্বপ্নে যারা পেয়ে গেছে সচেতন ফাউণ্টেন পেন
তাদেরও কলমে দেখ
সূর্যকিরণের মতো কোনো কালি নেই।

হে স্তন্যদায়িনী
তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন?
তোমার দুধের মধ্যে
প্রতিশ্রুত ভাস্করের পাথর কেবল।
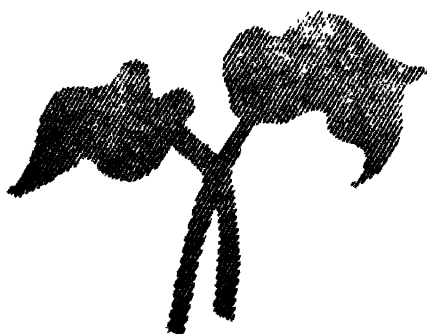
## শক্তি চট্টোপাধ্যায়

### প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

সিন্দুকের ডালা খোলা, তার মধ্যে রাজরাজেশ্বর
মোহর,
আমার ক্ষুধা একমুঠো ভাতের!
প্রয়োজন ছিল নদী, ঠেকেছি পাথরে,
সুখের কাপাস আনতে খোঁচাই কাতরে,
স্বাভাবিক ॥

## শক্তি চট্টোপাধ্যায়

### একটি দীর্ঘ গাছ

হত্যার পূর্বদিন তুমি কীভাবে বুঝতে পেরেছিলে
উল্লেখ করেছিলে, তোমার রক্তবিন্দু গোটা জাতিকে উজ্জীবিত
করবে।
এক টুকরো ইট তোমার কপালে লেগেছিলো,
তুমি ভয় পাওনি
মৃত্যুর মুহূর্তেও তুমি ঘাতককে নমস্কার করেছিলে।
তুমি ভয় পাওনি
মৃত্যুর মুহূর্তে তুমি ঘাতককে প্রণাম করেছিলে,
তুমি ভয় পাওনি
একটি দীর্ঘ গাছ ভারতবর্ষের বুকের উপর ভেঙে পড়লো হঠাৎ।

## শক্তি চট্টোপাধ্যায়

### স্বাধীনতার জন্যে

বুকের রক্ত মুখে তুললেও কবি বলে মানায় না হে
আজকে—বড়ো স্পষ্ট সকাল
বুলেট বুকে বিঁধলে তুমি যোদ্ধা হবে কিসের মোহে?
আজকে—বড়ো স্পষ্ট সকাল
মেরেই মরো
সমস্ত দিন সমস্ত রাত বুকের মধ্যে তৈরী করো:
স্বাধীনতার জন্যে, নচেৎ কিসের লড়াই?
'—সটকে পড়ো। সটকে পড়ো।'
সমস্ত দিন সমস্ত রাত বুকের মধ্যে তৈরী করো;
স্বাধীনতার জন্যে, নচেৎ কিসের লড়াই!

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

### ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর দাঁড়িয়ে

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
নিঃশব্দ রাত্রির দেশ, তার ওপরে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ
অদূরে খাজুরাহো মন্দিরের চূড়া
মিথুন মূর্তিগুলি দেয়াল ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠেছে আকাশে
নীল মখমলে শুয়ে নক্ষত্রদের মধ্যে চলেছে নৈসর্গিক প্রেম
আমি যে-কোনো দিকে যেতে পারি—
অথচ আমার কোনো দিক নেই!

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
সেই দিনটি ছিল বর্ষণসিক্ত
মাঝে মাঝে এমন হয়, আকাশ নিচে নেমে আসে
গাছগুলি দু'হাত বাড়িয়ে ডাকে, এসো, এসো
বোঝা যায় এখন এই পৃথিবী মানুষের জন্য নয়
বস্তু বিশ্বের মধ্যে চলেছে গভীর দেয়া-নেয়া
বিদ্যুৎ শিখার মধ্যে রয়েছে গহন কোনো বাণী
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে পায়ের তলার মাটি
এই রকম সময়ে দিক ঠিক করা সহজ নয়
আমি পা বাড়িয়ে থাকি,
কিন্তু কোন্ দিকে যাবো জানি না।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
দিঘির জলে ভাসছে গোলাপি শাড়ি-পরা বধূটির শব
তার পায়ের আলতা ধুয়ে যায় নি
তার হাত ভর্তি সবুজ কাচের চুড়ি—

তার ওষ্ঠ ও অধর তীব্র বিষের দাহে নীল
যারা সহজে চিৎকার করে তারাও চারদিকে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ
যারা অপরের হাতে নিহত হবার জন্য প্রস্তুত
তারাও আজ একটু একটু খুনী
এই দিঘির কাছে সে প্রত্যেকদিন তার মনের কথা বলতে আসতো
তার তীব্র দুঃখ ছিল না, তার তীব্র সুখ ছিল না
সে শুধু চেয়েছিল মাঝামাঝি ধরনের বেঁচে থাকতে
একটা কোনো জায়গা থেকে তো তার মৃত্যুর জন্য
উত্তর খুঁজে আনতে হবে
কোন্ দিকে? কোন্ দিকে?

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
ঝাঁসী, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, কানপুর, এলাহাবাদ
বিভিন্নমুখী বাস গোল হয়ে ঘিরে ফোঁস ফোঁস করছে—
যে-কোন একটায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেই হয়
কিন্তু কেন আমি নাগপুর না গিয়ে এলাহাবাদ যাবো না
অথবা হায়দ্রাবাদ না গিয়ে ঝাঁসী না-যাবার কোন্ যুক্তি আছে
ঠিক এক জায়গাতেই যাওয়ার গাড়ি-ভাড়া
আমাকে একবারের বেশি দু'বার সুযোগ দেওয়া হবে না
আমাকে পাঠানো হয়েছে মাত্র একটি জীবন কাটাবার জন্য
একটি জেলখানা থেকে বেরিয়ে শুধু একদিকে যাবার মুক্তি
চোখ বুজে ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে শুধু একটি কাগজের টুকরো
আমি চোখ বুজলাম
এইরকম সময়ে মানুষ চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে
এবং বৃক্ষের মতন স্থাণু হয়।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
চতুর্দিকে সব কিছুই অচেনা
দু' দিক দিয়ে মানুষ আসে যায়, কেউ থামে না

কেউ চোখের দিকে চোখ ফেলে না
কেউ আমার কথা বোঝে না, আমি কারুর কথা বুঝি না
কারুর হাতে উজ্জ্বল নীল রঙের বল, কারুর হাতে পাংশু রঙের থালা
কেউ মুঠো মুঠো বাতাস খায়, কেউ অ্যালকহল দিয়ে দাঁত মাজে
জীবন্ত যুবতীর বুকে শকুন এসে ঠোকরায়, তারা হাসে
শিশু এসে মায়ের আদর কাড়তে চাইলে, মা কাঁদে
পোশাকের দোকানে মানুষ ঝুলছে, অপর মানুষের কোনো পোশাক নেই
মাংসের দোকানে মানুষ ঝুলছে, অপর মানুষের কোনো মাংস নেই
এই ঘোর অচেনা রাজ্যে আমি একটু দাঁড়াবারও জায়গা পাই না
আমি কি এখানকার কেউ নয়
এ আমার দেশ, এ আমার দেশ বলে চিৎকার করে উঠি
কর্ণপাত করে না একজনও
এমন কি আমার দেশও কোন উত্তর দেয় না!

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম
একটি ঠিকানাহীন চিঠি এসেছে, আমায় যেতে হবে
যেমনভাবে মৃত্যুর নির্ভুল চিঠি আসে
কিন্তু মৃত্যু কারুর জন্য অপেক্ষা করে না, আমার জন্য
একজন প্রতীক্ষায় বসে আছে
সে কোথায় জানি না, সে কি সমুদ্র-কিনারে
কিংবা হিমালয়ের মর্মছায়ায়
সে কি বন্যায় ধুয়ে যাওয়া মাটির ওপর নতুন পলিতে দাঁড়িয়ে আছে
সে কি শুকনো, জিভ বার করে, ক্লান্ত জঙ্গলের মধ্যে একাকী শয়ান
সে কি কোনো বিশাল প্লাটফর্মের পাশের জটলার মধ্যে
বসে আছে জানু পেতে
সে আমার বড় বড় চোখ, বিস্ময়ের বিমূর্ত ছেলেবেলা
আমি মানচিত্রের গলি-ঘুঁজির মধ্যে ছোটাছুটি করি
আমায় যেতে হবে, যেতে হবে!

ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি
সেই ধানক্ষেতের জায়গায় এখন ধানক্ষেত নেই
সেই নদীর ভিতরে নেই নদী
নগর উড়ে গেছে শূন্যে, সেখানে সব ছাদ-খোলা মানুষ
সেই একই মানুষের মধ্যে অন্য মানুষ
রক্তছড়ানো গোধূলি আকাশের নিচে এক অলীক দেশ
একদিন যারা অনুসরণকারী ছিল
আজ তারাই পলাতক
মহাকূর্মের পিঠে এক অন্ধ লিখে যাচ্ছে ইতিহাস
এক জননী তার প্রতিটি সন্তানের জন্য
একটি করে মুর্গির ডিমও প্রসব করতে পারে নি, এই তার খেদ
যেখানে স্থাপত্য ছিল, সেখানে আজ সুড়ঙ্গ
যেখানেই যাই, সেখানেই শুনি এখানে নয়, এখানে নয়,
অথচ কোথাও তো হৃদয় থাকবে এবং তার মধ্যে ভালোবাসা
বিজন নদীর ধার দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি
উৎস কিংবা মোহনার দিকে!
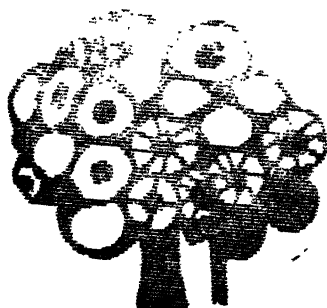
## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

### আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে

আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে আছি উনিশশো ছিয়াশিতে?
লজ্জায় আমার মাথা ঝুঁকে পড়ে
রাগে সারা গায় জ্বালা ধরায়
দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়
চীৎকার করে উঠতে চাই কর্কশ গদ্যভাষায়
আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে আছি···

পরিসংখ্যানে শুনি এদেশে সকলের জন্য খাদ্য আছে
কানকুন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে বিশ্ববাসীকে বলেছিলেন
ভারত আর অন্নভিখারী নয়
তবু এদেশের অর্ধেকের বেশী মানুষ দু'বেলা খেতে পাওয়ার
স্বপ্নও দেখে না
বাঁধের ওপর আমরা বসে থাকতে দেখেছি
ক্ষুধার্ত শিশুর পিতাদের অসহায় অলেগা শরীর
আমরা শহরের ফুটপাথ দেখেছি, গ্রামের গঞ্জ, বাজার
হাটখোলা দেখেছি
আমরা পার্কস্ট্রীট, বড়বাজার, ওয়াটগঞ্জ দেখেছি
আমরা রাইটার্স বিল্ডিংসের পালাবদল দেখেছি
আমরা দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথ জুড়ে
নপুংসকদের কষের ফেনা গড়াতে দেখেছি
এ কোন্ ভারতবর্ষে আমরা···

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের নিন্দে করার
কোন অধিকার আমাদের নেই
কারণ, এ দেশে হরিজনদের যখন-তখন আমরা পুড়িয়ে মারি

মার্কিন দেশের বর্ণবিদ্বেষ তো কিছুই না
এ দেশের কালো মেয়েদের এখনো টাকার ওজনে বিয়ে হয়
কিংবা হয় না
কিংবা, পরে তারা গায়ে কেরোসিন ঢালে
আমেরিকা রাশিয়ার পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কার চেয়েও ভয়ংকর
আমাদের আত্মপ্রতারক, খালি হাতের
লাঠি, ছুরি, বোমার গৃহযুদ্ধ
এখনো মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, গুরুদ্বারে বিকট ধ্বনি ওঠে
ধর্মের নামে রাস্তায় রাস্তায় রক্ত
আঃ, ধর্ম শব্দটি একদা কত সুন্দর ছিল, এখন
পুঁজ-রক্ত আর স্বার্থপরতায় মাখা
ধর্ম তো আফিম নয়, জাতীয়তাবাদ নয়,
ব্যক্তিগত শুদ্ধি নয়
শুধু ভেড়ার পালের পরিচালকদের উন্নত লাঠি
আমি দ্বিধাহীনভাবে শত সহস্র নিঃশব্দ প্রতিবাদকারীর সঙ্গে
কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই
যে হিন্দু রোজ পুজো-আচ্চায় মাতে
যে মুসলমান রোজ পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে
যে খ্রিস্টান অন্য ধর্মের মানুষদের অধঃপতিত মনে করে
যে শিখ শুধু ধর্মের দাবিতে রাজনৈতিক অধিকার চায়
তারা শুধু আত্মপ্রবঞ্চক নয়, অধার্মিক
প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তারা মাতৃহত্যা, শিশুহত্যার জন্য দায়ী
তারা যে অপরের হাতের ক্রীড়নক সেটুকু বুঝবার
ক্ষমতাও তাদের নেই
তারা মানুষের সাম্যের মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া তুলে দিচ্ছে
এ কোন্ ভারতবর্ষে আমরা…

## সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

### দেশ, আমার গৌরী

খৃস্টাব্দ, হিসাব নয়। নীলিমার নীতি শিখে হাঁস
বহুবার যুদ্ধের ওপর দিয়ে ক্রুশ শিখে উড়ে গেছে ভারী
গ্রন্থাবলী মনীষার দিকে ; অবিশ্বাস
আলিঙ্গনের উত্তাপ শিখে হয়ে গেছে নারী
যার শরীরেও ভারতবর্ষের মানচিত্র। যেন ইচ্ছামাত্র নদী, উৎসে
গৌরী, গিরিকুমারী, অথবা ঐ সুলসচ্ছল প্রত্যঙ্গের
দীপন এড়িয়ে যন্ত্রবাহনের নিখুঁত কিলোমিটার দৌড়
সব আত্মায় অগ্রাহ্য করে আজো তপোবনে ও শান্তি ওঁ—অর্থাৎ মন্ত্রের
টায়-টায় ঈশ্বর জাগিয়ে রাখা ; দেশ আমার স্বদেশ, গৌড়
থেকে দ্রাবিড়ভূমির নারিকেলবীথির উচ্চতা
আদ্যোপান্ত ঘুরে এসে তবু জনসাধারণ ভাবে তোমাকে হ'লো না চেনা !
শুনেছি ক্ষুধায় মানুষকে বড় পবিত্র দেখায়, আনে ভঙ্গীর মমতা
আমি খৃস্টশতকের এক অম্লান মানুষ
ক্ষুধা নিয়ে গিয়েছি যখনি, তুমি ধারণের দেনা
শুধেছো সপ্রাণ শস্যে, তবু তার বাৎসরিক ক্রম
জানাও নি, জানতে দাও নি, মা আমি না সন্তান !

মা আমি লাঙল পারি না

তাই প্রতিদিন কলমের হাত ধরে অক্ষরের শাদা-পাতা পরিশ্রম
সাক্ষী রাখি, খুঁড়ে চলি নিজের হৃদয়, অথচ জানি না
কখনো রক্তের সঙ্গে স্বাধীনতার টাটকা ইতিহাস
মৃত্যুর উত্তম নিয়ে কবিতার সৌজন্য এড়িয়ে শেষ উঠে আসবে কিনা ?

দেশ আমার স্বদেশ, শত্রুকে শেখাও আজ তেমন উল্লাস।

## অমিতাভ দাশগুপ্ত

### আমার নাম ভারতবর্ষ

স্টেনগানের বুলেটে বুলেটে
আমার ঝাঁঝরা বুকের ওপর ফুটে উঠছে যে মানচিত্র—
তার নাম ভারতবর্ষ।

আমার প্রতিটি রক্তের ফোঁটা দিয়ে
চা-বাগিচায় কফি ক্ষেতে,
কয়লা খাদানে, পাহাড়ে অরণ্যে
লেখা হয়েছে যে ভালোবাসা—
তার নাম ভারতবর্ষ।

আমার অশ্রুর জলসেচে আর হাড়ের ফসফেট-এ
খুনীর চেয়েও রুক্ষ কঠোর মাটিতে
বোনা হয়েছে যে অন্তহীন ধান ও গানের স্বপ্ন—
তার নাম ভারতবর্ষ।

আমার ঠাণ্ডা মুখের ওপর
এখন গাঢ় হয়ে জমে আছে
ভাক্‌রা-নাঙালের পাথুরে বাঁধের গম্ভীর ছায়া।
ডিগবয়ের বুক থেকে
মায়ের দুধের মত উঠে আসা তেলে ভেসে যাচ্ছে
আমার সারা শরীর।
কপাল থেকে দাঙ্গার রক্ত মুছে ফেলে
আমাকে বুকে ক'রে তুলে নিতে এসেছে
আমেদাবাদের সুতোকলের জঙ্গী মজুর।

আমার মৃতদেহের পাহারাদার আজ
প্রতিটি হালবহনকারী বলরাম।
প্রতিটি ধর্ষিতা আদিবাসী যুবতীর
শোক নয়, ক্রোধের আগুনে
দাউ দাউ জ্বলে যাচ্ছে আমার শেষ শয্যা।

ভরাট গর্ভের মত
আকাশে আকাশে কেঁপে উঠছে মেঘ।
বৃষ্টি আসবে।
ঘাতকের স্টেনগান আর আমার মাঝ বরাবর
বয়ে যাবে বরফ-গলা গঙ্গোত্রী।
আর একটু পরেই প্রতিটি মরা খাল-বিল পুকুর
কানায় কানায় ভরে উঠবে আমার মায়ের চোখের মত।
প্রতিটি পাথর ঢেকে যাবে উদ্ভিদের সবুজ চুম্বনে।

ওড়িশির ছন্দে ভরতনাট্যমের মুদ্রায়
সাঁওতালি মাদলে আর ভাঙরার আলোড়নে
জেগে উঠবে তুমুল উৎসবের রাত।
সেই রাতে
সেই তারায় ফেটে-পড়া মেহ্‌ফিলের রাতে
তোমরা ভুলে যেও না আমাকে
যার ছেঁড়া হাত, ফাঁসা জঠর, উপড়ে-আনা কলজে,
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, রক্ত, ঘাম
মাইল মাইল অভিমান আর ভালোবাসার নাম
স্বদেশ
স্বাধীনতা
ভারতবর্ষ॥

## অমিতাভ দাশগুপ্ত

### স্বদেশ

টুঁটি ছিঁড়ে কিছু রক্ত ঢেলেছি করবীর মূলে।
ভুল হয়েছিল?
ছুটে চলে গেছি পাহাড়তলির নীল ইস্কুলে।
ভুল হয়েছিল?
মেঘ একটানে কালো টুপি খুলে হঠাৎ যেখানে
অবাধ ঝর্ণা,
ধর্মঘটের মত বোল্ডারে আছাড়ি-পিছাড়ি
ক্ষ্যাপাটে জোয়ার,
ঝাংচুয়ারির সবুজ গহনে হাতির খেদায়
অনিদ্র রাত,
এ-মুড়ো ও-মুড়ো উত্তর থেকে দক্ষিণে ফেরা—
ভুল হয়েছিল?

ভিখারী বালক স্বপ্নে পেয়েছে একথালা যুঁই।
তাড়িত স্বপ্নে
মায়ের বুকের দুধের মতন ফিনিকে ফিনিকে
ধানের বন্যা
তিনখানা ইঁটে-পাতা উনুনের আঁচে ফুটপাতে
গাঁওছুট বুড়ি
স্বপ্নে দেখছে দেশের ভিটায় লোক ঝমঝম
ভরা সংসার!

শহরে রক্ত কারবাইডের জ্বালায় ক্ষিপ্ত,
হা রে যৌবন,
এই সব কিছু মিলিয়ে আমার স্বদেশ
আমার রক্ত মাংস,
ভালোবেসে-বেসে চোখ চলে যায়—ভালোবাসা
সে কি ভুল হয়েছিল?

## সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

### ভারতবর্ষ, তুমি বড় প্রিয় নাম

ভারতবর্ষ, তুমি বড় প্রিয় নাম
কমল আঁখির মত
ললাটে লিখেছি আমি।

বৈশাখে কোনো কোনো দ্বিপ্রহর
নিশীথের মত মনে হয় এত চুপ,
এই দেশ জেগে থাকে

ভারতবর্ষ, তুমি বড় প্রিয় নাম
তোমার দু'চোখে মরুভূমি জেগে থাকে
কেউ নেই খাঁ খাঁ চারিধার
অগ্নিসংকাশ চোখ সারাদিন মরু তাঁর ধরে রাখে!

তবু কি কোথাও তৃণ শাল্মলী লতা
হরিৎ পাহাড় ছিল
মানুষের মন—

দ্বিপ্রহর নিশীথের মত মনে হয় এত চুপ
অবিদিত রয়ে গেল বাসভূমি
জানি না কোথায় উপলেতে
নদীর শব্দরা জেগে আছে!

## অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

### এখন স্বদেশ

আগে স্বদেশ মানে বুঝতাম থৈ-থৈ বিলের জল আশ্বিনেও
আঁটছে না কোথাও
বৌদ্ধযুগে অবিরাম বৈশালীর সঙ্ঘারাম, তাতে
ত্রিপিটক, সিংহলের দূত আর ধূপের ভেতর যেন অনন্ত গেরুয়া—

স্বদেশ মানে বুঝতাম দ্রুত কোনো জলযানে হরপ্পার স্তব্ধতায়
প্রত্নতাত্ত্বিকের জন্যে অপেক্ষায় থাকা
অর্থাৎ স্বদেশ আমার সময়-সীমানাহীন অন্তর্গত ভালবাসা
বিজন নয়ানে ফের
রোমাঞ্চিত বিহারের গ্রাম—বিভূতি বাঁড়ুজ্যের হাতে অপু-দুর্গা
দুর্ভিক্ষের রাগ, লবটুলিয়ার ক্ষুধা আর
ধু-ধু এক কৈশোরের অশেষ বেদনা

স্বদেশ আমার মুহূর্তও স্থির চোখে ঘুমোতে দিল না
বন্যা ও ভাসানে, তেভাগায়, সঙের মুখোশে
বারবার ডুবে গেছি অবান্তর কুটোর মতন, অবশেষে
আড়াআড়ি চিরে দিল
বোধ মাটি মানচিত্র যা-কিছু আমার

এখন কোথাও বসে ভাবতে চাই যদি
কে যেন কাঁধের পাশে অনর্গল ঝুঁকে প'ড়ে ছাখে
এখন লেখার জন্যে বিশ্রামের বাদা খুঁজলে
আগেই দখল নিয়ে বসে থাকে কারা
এখন রক্তাক্ত আঙুল খোঁজে আদিগন্ত মেঘের ব্যাণ্ডেজ
এখন স্বদেশ বললে
বিতাড়িত ভবঘুরে ঠিক আর বোঝে না কিছুই।

## তারাপদ রায়

### ক্রমাগত স্বাধীনতা চাই

মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই,
নদীর স্রোতের মত অনায়াস,
বৃষ্টির ধারার মত সাবলীল
ক্রমাগত স্বাধীনতা চাই ;
যে-রকম ক্রমাগত ফুল ফোটে, গাছে গাছে পাখি,
ছেলেরা ইস্কুলে যায়, যে রকম গ্যালারি ডিঙিয়ে
অব্যর্থ ছয়ের রান নীলশূন্যে পাখির মতন।

নীলশূন্যে পাখির মতন ক্রমাগত ভেসে যাওয়া
কিংবা ভাবো জলে মাছ, উঠোনে বিড়াল খেলা করে,
ছোটোখাটো ভালোবাসা আমাদের বুদ্ধি ও বিবেক।
আমাদের ভালোবাসা, আমাদের স্বাধীনতা
নদীর স্রোতের কিংবা বৃষ্টির ধারায়
ক্রমাগত ভেসে যাওয়া, ক্রমাগত সাবলীল
ক্রমাগত অনায়াস স্বাধীনতা চাই,
সীমা ও বন্ধনহীন, অনুকম্পাহীন
অমার্জিত, অপরান্ত স্বাধীনতা
স্বাধীনতা নদীর স্রোতের
ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ে, ছেলেরা ইস্কুলে যায়, পাখি,
জলে মাছ, ফুল ফোটে
আমাদের ক্রমাগত স্বাধীনতা চাই।

## সামসুল হক

### দিঘি

ওই দিঘির জলের তলায় একটা শাদা শাড়ি আস্তে-আস্তে ডুবে যাচ্ছে।

ওই দিঘির একবুক জলে সে তখনো দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে তখনো
বৃদ্ধ বটের ছায়া তাকে ঘিরে আছে—গাছের উপরে বৃদ্ধ শকুন,
কিন্তু জলে শকুনের ছায়া দেখা যায় না।

ওই দিঘির একবুক জলে সে তখনও দাঁড়িয়ে আছে, সামনে তখনো
পদ্মের মতো পঙ্কজ ভেসে আছে—ওঁটার শরীর ছুঁয়ে
ছায়ার মতো একটা সাপ পশ্চিমদিক থেকে এগিয়ে আসছে;
সে শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের মতো সেদিকে চেয়ে থাকে।

ওই দিঘির একবুক জলে সে তখনো দাঁড়িয়ে আছে, ডানদিকে তখনো
কলমিদামের উপরে ডানাভাঙা বক মাথা ঝাঁকচ্ছে, গলার ভিতরে
একটা ছোট্টো খেয়াড়া মাছ দারুণ আটকে গেছে—
বকটা কি সূর্যাস্তের আগে যোগ্যতার সঙ্গে উড়ে যেতে পারবে?

এই দিঘির একবুক জলে সে তখনো দাঁড়িয়ে আছে, বাঁদিকে তখনো
গায়ে লাল ধুলো মেখে, লাল শার্ট হাতে নিয়ে,
যেন কয়েক কোটি মানুষের শরীর নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

ওই দিঘির একবুক জলে সে তখনো দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছি,
একবুক জলে রানী: লোকে যাকে ভারতবর্ষ বলে।

জলের তলায় তার শাদা শাড়ি আস্তে-আস্তে ডুবে যাচ্ছে···

## প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

### প্রিয় মাটি

প্রিয় মাটি, এখন মৃত্যুর কথা শুধু ভাবি,
তোমাকে ভাবি না
তুমি গাছ-ফুল-লতা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছো,
সমস্ত মানুষজন তোমার বুকের ওমে লুকিয়ে রয়েছে —
ট্রেন আসে যায়, যেন তুমি খেলনা গড়েছো,
তাই খেলা,
তাই খেলা রাত্রিদিন, এখানে ওখানে, আশে পাশে,
প্রিয় মাটি, তুমি ত্যাগ আমাকে করেছো, নাকি
আমিই তোমাকে ?
এখন মৃত্যুর কথা শুধু ভাবি, তোমাকে ভাবি না ॥

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

## বিদ্যুচ্চমকে দেখা যায়
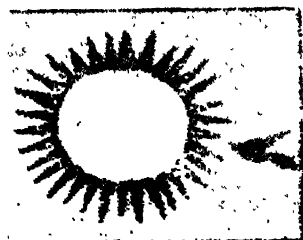
বিদ্যুচ্চমকে দেখা যায়—
অর্ধেক মানুষ আজ মরে আছে আমার স্বদেশে।
মরে আছে, তবু তারা কথা বলে,
বাসে ওঠে, বাস থেকে নামে।
পরস্পারের দিকে থুতু ছুড়ে হো হো ক'রে হাসে।
এত গাঢ় অন্ধকার, প্রথমে কিছুই চোখে পড়ে না সহজে।
কিন্তু যদি দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ করা যায়,
শরীরে সমস্ত রক্ত এক জায়গায় জড়ো হয়,
তা হ'লে বুকের ভিতর থেকে ঠেলে-বাইরে-চ'লে-আসা
বিদ্যুৎ-চমকে দেখা যায়—
অন্তত অর্ধেক লোক মরে আছে আমার স্বদেশে।
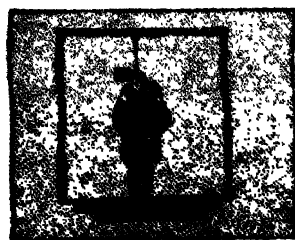
মণিভূষণ ভট্টাচার্য

## বিশ্বামিত্র

ফুলের বাগান খুলে আকাশ জেগেছে সারা রাত
রূপে দিন জ্বলে যায় অন্ধের ব্যাকুল অনুমানে
আয়ুধ আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়,
শুদ্ধি চায় হাত—

সামান্য ও অসামান্যে সামান্য তফাৎ তনুত্রাণে।
কালো দিন কালো রাত্রি কালো ঢেউ
অনন্তে নাচায়,
এই দেশ রুক্ষ দেবদাসী—
হাতে তার প্রলয় প্রদীপ জ্বলে,
ইতিহাস রাষ্ট্রচূর্ণ খায়,
জাগে প্রাণ প্রাচ্যের সন্ন্যাসী।

# আশিস সান্যাল

## এ-ভারত

তুমি কোন্ দিকে যাবে ? প্রথম বান্ধব
সহাস্যে দু'হাত নেড়ে বলে : পুব দিকে।
এখনো দরোজা খোলা। দূরের মন্দিরে
আরতির ঘণ্টা বাজে—মৃদু শোনা যায়।
দ্বিতীয় বান্ধব বলে : পশ্চিম সীমায়—
আজানের ধ্বনি শোনো ছড়ায় বাতাসে।
আমি যাবো সেইখানে। তৃতীয় বান্ধব
নীরবে দু'চোখ মেলে বলে : আজ আমি
বুদ্ধের শরণে পথে সর্বত্র গচ্ছামি।

চতুর্থ বান্ধব গেলো নির্ভয়ে দিশায়।
চারপথে ধরে গেলো চারটি বান্ধব
প্রেমিকের মতো একা। ভোরের নির্মল
ভরে দিলো যেন সব প্রশস্ত সরণি।
সবাই যাবার আগে বলে গেলো হেসে :
এ-ভারত আমাদের প্রিয় জন্মভূমি।

## দিব্যেন্দু পালিত

### ভারতবর্ষ

হোটেলের লবিতে বসে লুসি বলল,
'ভারতবর্ষ !  খুব চিনি !'

অবশ্য সে ভারতবর্ষ বলে নি, বলেছিল ইণ্ডিয়া—
বলতে বলতে ঝাঁকুনি দিয়েছিল তার সোনালি চুলে ;
স্কার্টের তলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা হাঁটু দুটো
এবং হাঁটুর নিচে পা দু'খানি
চেনালো
ভারতবর্ষ অনেক দূরে।

আমস্টার্ডামের বৃষ্টি ভারতবর্ষে পড়ে না।
এখানে যখন রাস্তা ক্রমশ ছেয়ে যাচ্ছে বরফে
তখন ওখানে কী হচ্ছে দেবা ন জানন্তি :
বরফ বললেই মনে পড়ে হিমালয়, তেনজিং নোরকে, ইয়েতি,
আর মর্গের ভিতর শুয়ে থাকা একা মানুষ,
আর হঠাৎ ধস নামায় বিচ্যুত কালিম্পং, দার্জিলিং সিমলা।

'আমি ভারতবর্ষ যাবার আগে
সবাই মানা করেছিল আমাকে।
বলেছিল, যেও না—
কারণ তোমার চুল সোনালি,
কারণ তুমি স্বাস্থ্যবতী,
কারণ তুমি সুন্দরী—
ওরা তোমাকে রেপ্ করবে।'

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলুম ওর কথা ;
আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলুম বাইরে বৃষ্টি।

লুসি তার ভদ্রতা আরো মধুর ক'রে বলল,
'কী আশ্চর্য দেশ এই ভারতবর্ষ !
কী সুন্দর এই মানুষেরা !
আমি আর আমার বান্ধবী—
ভেবে ছাখো দুটি সোনালি চুলের সুন্দরী মেয়ে—
ছ'মাস ধরে ঘুরে বেড়ালাম ভারতবর্ষে,
কিন্তু কেউ আমাদের
রেপ্ তো দূরের কথা
গা পর্যন্ত ছুঁলো না !'

## পার্থসারথি চৌধুরী

### ভারতবর্ষ

অগম্য আঁধার থেকে আলোকের বিভ্রান্ত সজ্জায়
বিস্তারিত এ ব্যবধি, প্রকৃতির পুরাতন ভূমি।
শতলক্ষ কল্পান্তের অহর্নিশ অভ্রান্ত চলায়,
প্রশান্ত সহিষ্ণু ধ্যানে শান্তিমগ্ন অনন্ত মৌসুমী।

মার্তণ্ডের সহচর, অরণ্যের অধিষ্ঠাতৃ-দেব,
নদীর উপলে, ভগ্ন গিরিখাতে অজ্ঞাত ভয়াল,
তিতিক্ষায় চিরজীবী সত্যসন্ধ বিবাগী ভৈরব,
নির্জন স্বভাবশৈলে লোকোত্তর রুদ্র মহাকাল।

অর্বাচীন স্তাবকেরা আপাতত মগ্ন ব্যভিচারে,
প্রাচীন ক্লান্তির ঘোরে রমণীয় প্রাণসমুচ্চয় :
শিলীভূত ক্লৈব্যে মৃত জীবনের সহজ সরণি,
ম্লানমুখে ছায়া কাঁপে স্মৃতিশূন্য মেদাক্ত বিহারে,
ভ্রষ্ট নষ্ট জনযূথে সম্ভাবিত আসন্ন প্রলয়,
পাতকের ধনপিণ্ড অন্তিমের যজ্ঞের অরণি।
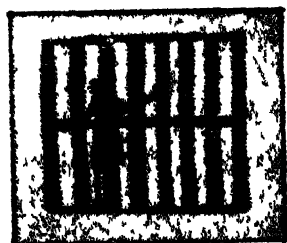
## পবিত্র মুখোপাধ্যায়

### ভারতবর্ষ

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতেঃ
ঠাকুমা ঃ লক্ষ্মী
প্রব হবেন করুণায়, ক্ষেতে
সোনা, জ্যোৎস্নায়
শিশির-মাখা-পাতা ভাসছে, দ…
তারার প্রতিবিম্ব, বাতাসে
শিউলির গন্ধ, তিনি
আসবেন, সরাই
ভাসবে, নূপুর
বাজবে উঠোনে

লক্ষ্মীমন্ত বউ আনলেন, বরণ
কোরলেন, চাবি
তুলে দিলেন হাতে,
সংসারের দায় এবং
নিজেরও ; ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে
স্বপ্ন দেখলেন ঃ ওই
মাঠ ভরে গেছে ফসলে,
গোলার ধান পড়ছে
উপ্‌চে, বউটা
পয়মন্ত

এক ফসলী ক্ষেতের ভাগ্য নিয়ে
খেলে বন্যা, খেলে খরা ;
মহাজনী-চক্র ঘোরে, তাতে

জড়িয়ে পড়ে ছেলেটা ; বুড়ি
চোখ বোজে, বউটা
অপয়া !

লক্ষ্মী আসেন
জ্যোৎস্নায় সাদা পেঁচার ওড়াউড়ি
তারা গ'লে জল হয়ে নামে
ঘাসের উপর ;
গোলাঘরে ইঁদুর,
বউটার শিরা-ফোলা-হাতের
খস্‌খস্‌, ছেঁড়াকাঁথায় শুয়ে
সে স্বপ্ন দেখে :
লক্ষ্মী
দ্রব হবেন করুণায়
একদিন ॥

দেবী রায়

## এই সেই তোমার দেশ

**'Poems Admit of No Compromises.**
**but We live by compromises.'**

—GUNTAR GRASS

এই সেই তোমার দেশ—যেখানে একই সঙ্গে একই কালে
ভরপুর আস্থা বিজ্ঞান, আবার ছায়ার মতো চালিত হয় কুসংস্কার

এই সেই তোমার দেশ—যেখানে একই সঙ্গে একই কালে
গ্রহণ করে আধুনিকতা, মেনেও নেয় পাশাপাশি রক্ষণশীলতা

এই সেই তোমার দেশ—যেখানে একই সঙ্গে একই কালে
বিপ্লবকে রুখবার জন্য আরেক বিপ্লবের জন্ম দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে

এই সেই তোমার দেশ—যেখানে একই সঙ্গে একই কালে
একদিকে গাছের গোড়ায় জল ঢালে, বেড়া বাঁধে—আর—

অন্যপাশে তাকিয়ে ছাখো, অরণ্যকে অরণ্য কেটে ফাঁক করে
এই সেই তোমার দেশ যেখানে একই সঙ্গে একই কালে

দৈবকে মেনে নেয়, আর নিচু ও করে মাথা…
আপোস মেনে মেনে পাপোষ বনে যায়

এই সেই তোমার দেশ
যেখানে বিদ্রোহের স্থান কোনদিনই ছিল না

এই সেই তোমার দেশ যেখানে একই সঙ্গে একই কালে
পুনর্জন্ম এবং কর্মফলের ধারণা পাশাপাশি হাত ধরে হাঁটে

এই সেই তোমার দেশ—
যেখানে অনশন ছাড়া আর কোনো কিছুই করার ছিলো না।

## ঈশ্বর ত্রিপাঠী

### স্বাধীনতা

ক্রমশই সরে যাচ্ছে, ক্রমশই ধ্বসে যাচ্ছে স্বাধীনতা
উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে যে সকল অমূর্ত স্বপ্নেরা
উত্তরে হিমাদ্রি থেকে দক্ষিণের কন্যা-কুমারিকা
সকল প্রাণের কণা উজ্জীবিত করেছিল হিরণ্য প্রভায়
ক্রমশই ভেঙে যাচ্ছে তারা সব, ক্রমশই ম্লান হচ্ছে
আমাদের স্বপ্ন স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা এনে দেয় অধিকার, অধিকার শব্দের সংজ্ঞায়
সুবৃষ্টি ও সুবাতাস, উর্বর মৃত্তিকা, সূর্যালোক
নিহিতার্থ থাকে, স্বাধীনতা সব অঙ্কুরের উদগমে উদ্দীপ্ত
করে, জীবনের মর্মমূলে প্রোথিত বিষাক্ত তীরগুলি
উন্মূলিত করে, স্বাধীনতা মুক্তি দেয় দারিদ্র্যের গ্লানি হতে,
পৃথিবীর মুখ সুভাষিত করে দেয় স্বাধীনতা দর্শনে বিজ্ঞানে।

ক্রমশই রিক্ত হচ্ছে, ক্রমশই ভ্রষ্ট হচ্ছে স্বাধীনতা;
স্বাধীনতা শব্দের সৌরভ ক্রমশই হৃত হচ্ছে বিষাক্ত হাওয়ায়!
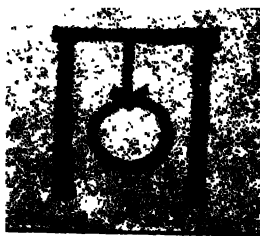
## শান্তনু দাস

### জন্মভূমি

তোমার কাছে আসতে পারি
জ্বললে আগুন,
তোমার ডালে পাতা বোনার শব্দ শুনি
ফুটলে কুসুম,
তোমার কোলে মুখ রাখলে বাজনা বাজে
দশ দেয়ালে,
কপোলতলে দীর্ঘায়ু হয় আমার জীবন!
তোমার চোখে চোখ রাখলে চল নেমে যায়
ভাসাই তরী পাঁচ আঙুলে,
নদীর মতন
পাঁচটা বেণী
সমুদ্র হয় কিংবা সময়
এপার থেকে ওপার ডিঙা বাইরে পারে।

তোমার কাছে আসতে পারি জন্মভূমি
জ্বললে আগুন
তোমার চোখে চোখ রাখলে মা জননী
নিজের ছুরি কাউকে বা খুন করেই
বসে
চার দেয়ালে,
দশ দেয়ালে আকাশ নামে
আকাশ ভেঙে সমুদ্র হয়,

কপোলতলে দীর্ঘায়ু হয় আমার জীবন।

## শান্তনু দাস

### আমার দেশ

এখন ভারতবর্ষ একান্ত আমার।
আর্য বা অনার্য আমার ভাই।
অথচ, আমরা কেউ কাউকে আদতে চিনি না,
ভাই হে, তুমি আমার ভাষাই বোঝো না।
ছাড়ানো রাঙ-এর মতো টুকরো হয়ে যাচ্ছে দেশ,
দুর্ভাগা স্বদেশ।

আমার দেশ ভারতবর্ষ—
সেখানে হিজড়ে বা সতীর আশ্চর্য সহ-অবস্থান।
প্রতিদিন একজন মানুষীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা।
আমাদের ভাইরা এখন আমাদের শ্রেণীশত্রু।
আমাদের একহাতে চোরা গুপ্তি,
অন্যহাতে তুলো ও ডেটল।

কী ভাষা, কী নীতি এই এক সরব যন্ত্রণা।
কে কাকে সড়কির আগে তুলে নেবে—
তার আগে গভীর প্রস্তুতি।
তারই মাঝে উঠে যাচ্ছে স্কাই-স্ক্র্যাপার।
আমাদের এক আশ্চর্য চোলাই
বিষ তবু না ছুঁয়ে পারে না বেতমীজ।

জন্মভূমি তুমি আজ আশ্চর্য প্যারডি!

## ভাস্কর চক্রবর্তী

### স্বদেশ

এখন কেমন আছো সাতাত্তরে ?
স্বচ্ছ কিছু
হ'লে কি এবার ?
সেই শৈশবের থেকে
কালো দিনগুলো তুমি
আমাকে ছুড়েছো···
আমি উঠি, ধুয়ে-মুছে
সাফ রাখি তোমার নীলিমা।
তোমার নিকটে আমি সর্বদাই
বসে আছি।
ওয়েলিংটনের ফাঁকা
ফুটপাত থেকে,
যদিও চশমা খোয়া গ্যাছে, আর
খোয়া গ্যাছে
নতুন চপ্পল, তবু
যে কাঁধেই হাত রাখি
আমার বন্ধুর কাঁধ মনে হয়।
যে পথেই পথ-হাঁটি
মনে হয়
ছায়াপথ আজো
একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি—
বিস্কুট রঙের বিফলতা
একদিন মুছে যাবে
একদিন, তুমি
আরো কাছে টান দেবে
আমাকে, জননী।

## শান্তি সিংহ

### স্বদেশ আমার

আমি কি আজ পেয়েছি তোমার সজল ভালোবাসা
স্বদেশ, আমার স্বদেশ !
বিষাদ ঘন হৃদয়ে জাগে সে কোন্ গোপন আশা
স্বদেশ, আমার স্বদেশ !

দীর্ঘদিন নিদ্রাহীন শিয়রে বসে আছি
বুকের মাঝে গুঞ্জরিত সোনালি মৌমাছি
রাতের ঘন আঁধার চিরে নয়ানজুলির ধারে
কারা যে শুধু ইশারা ছায় গোপন চুপিসারে
আমি কি ভুলে তোমার কথা হবো নিরুদ্দেশ ?
স্বদেশ, আমার স্বদেশ !

অনেক ঝড় অনেক জ্বালা সয়েছি অকাতরে
দুঃখ বড়ো প্রবল হয়, তীব্র সুরে ঝরে !
তাই তো তোমায় গভীর করে ডাকি যে বারবার
স্বদেশ আমার, হে প্রিয় স্বদেশ, সকল অহঙ্কার।

শান্তি সিংহ

## ভারত

সুঠাম দেহটা বশে থাকছে না
অঙ্গে অঙ্গে সংঘর্ষের আগুন জ্বলছে
ঝরছে রক্ত।
আজন্ম পাশাপাশি থেকেও
হাড়ে হাড়ে আগুনের ফুলকি!
তর্জনী শুধুই ফুঁসছে
ভাব নেই তার প্রতিবেশী আঙুলগুলোর সঙ্গে
আপন অহঙ্কারের মাঝে
স্বরাট্—একেশ্বর
এও কি হয়?

একটাই হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ছুটছে
সর্বাঙ্গের ধমনী শিরায়
তবু এ বিদ্রোহ
এ বিপর্যয়
কেন?

## শান্তি সিংহ

### জাতীয় সংহতি

উত্তরখণ্ড মাথা নাড়ে
ঝাড়খণ্ড খোঁজে মাটি
জোড়াতালি দিতে চায়
মিজোরাম,
পঞ্জাবে
উগ্রপন্থীরা ঝরায় রক্ত—
কারণ
ভারতবর্ষকে অনেকেই ভুল বোঝে
কিংবা
দেশকে ভালোবাসার মতো আলো
তারা পায় নি।

আলগা মনে ভালোবাসা নেই,
দেশদ্রোহিতা বাড়ে,
অপাংক্তেয়রা পংক্তি বানায়
ঘাটে নয়—
বেঘাটে।

এই কি সাধের ভারতবর্ষ
আমার মানস প্রতিমা ?
আমি নিরন্তর হাঁতড়ে বেড়াই
আমার প্রিয়তা, সুখ, শান্তি—
কে যেন আমায় করে স্তম্ভিত !
কেন একথা বলতেই
বোবায় পায় আমার চেতনা ?

অথচ উত্তরণ চাই, প্রীতি চাই
আলো চাই
কারণ, আলোই জীবন !

## কমল চক্রবর্তী

### একত্রিশ বছর ধরে

স্বাধীনতার একত্রিশ বছর পেরুল
তবু এত জবা কেন ফোটে মা, আমার ভয় করে।
আমি খালপোলের নিতাই
সাতদিন পাঁচরাত্রি দৌড়ে এই দখলটুকু পেয়েছি
এই মানে না-মানে আকাশ
চোরের পেছনে ডাকু
নদীর পৈঠায় পারকর আমারে সন্ধ্যাবেলা।
শান্তির জন্য মন্ত্রীমশায় পায়রা ওড়ালেন কেন ?
আমার ভয় করে
একত্রিশ বছর ধরে পায়রায় পায়রায় আকাশে ছেয়ে গেল।
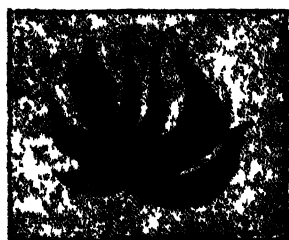
## সুব্রত রুদ্র

### উত্তরাধিকার

সিংভূমের গুরু
মিশনারী স্কুল থেকে পালিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আন্দোলনে

ওর বাপ জেল খেটেছে
ওর দাদা পরেছে ফাঁসীর দড়ি
ও কেন ছাড়বে ?

ওরা কেউ ভোলেনি।
১৮৩০-এর বারাসাত
৪০-এর ফরিদপুর বাখরগঞ্জ
৭০-এর ভোজপুর কৃষকেরা···

সামনে বহুদূর
মাটি মিশে গেছে রোদ্দুরে

দূর থেকে কাছে রোদ্দুরের রঙ বদলে যাচ্ছে

কৃষ্ণা বসু

## ভারত : ১৯৮৭

দ্বিতীয় অথবা প্রথম বিশ্বের কেউ নই বলে
মাঝে মাঝে দুঃখ হয় খুব, কেন আমি তৃতীয় বিশ্বের ?
কেন পরিত্যক্ত ওষুধের পাশে, উপনিবেশের ছায়া দিয়ে তৈরি
ম্লান ঘরদোরে থেকে যেতে হবে ? প্রবঞ্চিত হওয়ার চেয়ে,
প্রবঞ্চক হওয়া কি চের ভালো ছিল ? ভালো ছিল ?
অন্যের মেদ ও মজ্জা চুষে চুষে খাওয়া ভালো ছিল ?
করুণা ছিটোবার মুদ্রায় বিক্রয়বাজার চুঁড়ে মরা
এইসব ভালো ছিল চের ? কেন ভালো ছিল ?
কেন ভালো নয় এই সকরুণ উপমহাদেশ ?
কেন এর ময়লা আঁচল আজ জড়িয়েছে কেমন মায়ায়,
এই কথা ভুলে যাবো ? কি ভাবে ভুলবো ?
সতীর দেহের মতন টুকরো করে দেবে নাকি একে পুরাণ-দেবতা ?
সেই ছেঁড়াখোঁড়া অঙ্গ নিয়ে সন্ত মাতৃ-শোকাতুর,
কী করব আমরা যাদুকর নই তো যে
ছোঁড়াখোঁড়া অঙ্গগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে আবার ফিরিয়ে দেব প্রাণ,
আবার ফোটাবো তার চোখে সুচিকন হাসি ?

## সুরজিৎ ঘোষ

### ভুলতে পারিনি তাই

ভুলতে পারিনি তাই বলি,
সেইসব নির্জন বারুদের গন্ধ মাখা গলি
লুকিয়ে থাকবার ছোটো অচেনা শহরগুলি
উন্মাদ বালিকার গান।
মায়ের মতন কেউ বলেছিল কাছে এসে
ভাত বাড়ি, করে আয় স্নান।
পুকুরের পাশে কারা বসেছিল পাহারায়
অমনি দুপুর খান্ খান্
করে দিয়ে এ বাড়ির সদ্য বিধবা রমণীটি
এলোচুলে কেঁদেছিল, 'পাড়া ভরে গিয়েছে পুলিশে
এক্ষুণি পালান, পালান।'
কাঁটাবন ঝোপঝাড় হোগলার ভিতরে ছুটে যেতে
চোখে পড়েছিল তারা গুঁড়ি মেরে এসেছে-এগিয়ে
দুজনের হাতে স্টেনগান
ডানদিকে ঘুরতেই, দেখি আর কেউ নেই
সামনেই পুরনো শ্মশান।

ভুলতে পারিনি তাই বলি
সেইসব ছুটোছুটি, আধপোড়া শ্মশানের ছবি
মলিন চিতার থেকে রোগা ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে এসে
বুঝি প্রিয় মেয়েটির কুমারী কপাল জুড়ে
থেমেছিল বড়ো ভালোবেসে।
কতো অন্ধকার রাতে অচেনা ভাইয়ের মুখ

বন্ধুর ভস্মশেষ দেহ
অতৃপ্ত প্রেতের মতো আবছায়া দেখে গেছি
তারপর সারাদিন তাড়া করে ফিরেছে সন্দেহ।

আজ সুখী শহরের লম্পট রাতের বুকে বসে
মাঝে মাঝে স্বতন্ত্র সঙ্গীদের মুখ মনে পড়ে
ভুলতে পারি না, শুধু মাতালের মতো উঠি হেসে।
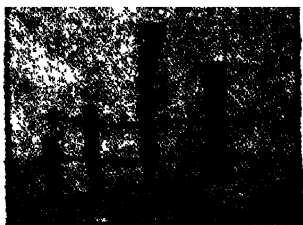
## শ্যামলকান্তি দাশ

### স্বাধীনতা

অভাবে মেরেছে যত, স্বভাবে মেরেছে তারও বেশী
আমি তাকে দিয়েছি ঠোঁটের ভাষা, ভুল
আজ সে নতুনভাবে উড়ে গেছে নতুন পাখির দেশে
আজ যেন স্বাধীনতা তার—
আমি তাকে পারিনি বিশেষ কিছু দিতে
আমি তাকে দিয়েছি ফুলের অধিকার !

## অঞ্জন সেন

### ভারতবর্ষ

বটগাছের ছায়ার নীচে বসে-থাকা পথিক
শোনে শুকসারীদের কথা
মহান এই জম্বুদ্বীপ—ফল ও ফুলে ভরা—
এখানে থাকেন সিদ্ধচারণগণ
জেটবিমান আর ঠেলাগাড়িতে যেতে দুটি লোক
ঠিক একই সময় ভাবে—এটা ভারতবর্ষ—
আর সাগর থেকে খুনের ঝড় ওঠে।

প্রাচ্যের রহস্য
হাওয়ায় ভাসে রামকাহিনীর টীকা
ব্রাহ্মীলিপির পাঠ
চণ্ডীদাসের গান

অশোকস্তম্ভ থেকে আলো ঝলসায়
গঙ্গা থেকে উঠে আসে নীল ও বাদামি
ঢুকে পড়ে শিরা-উপশিরায় অদৃশ্য হয়।

রুগ্ণ এক কৃষক যার ছিল না একটুখানিও ভূমি
শোনে আকাশবাণী—সত্যমেব জয়তে—
ভাবে সত্য না জানি কেমন দেখতে কতখানি লম্বা!
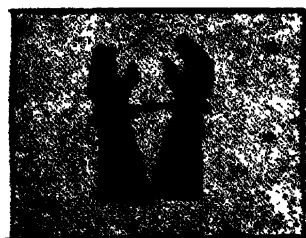
## স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

### ভারতবর্ষ

আসমুদ্রহিমাচল যার বন্দনায় রত,
নক্ষত্র-নিবিড় আকাশ যার রত্ন-আভরণ,
আদিম অরণ্যানীতে স্নিগ্ধ-সবুজ চিরন্তন যার মহাভূমি,
বিশ্বসভায় পায় শ্রেষ্ঠ সম্মান যার ঔদার্য, মৈত্রী, প্রীতি,
সর্বসমন্বয়—
সে আমার ভারতবর্ষ, আমার স্বদেশ—এর চেয়েও বড়
আর কোন্ গৌরব? কোন্ পরিচয়?

তবু হায়! সে স্বরূপ লুপ্ত আজ, সে আলেখ্য ম্লান, ম্রিয়মাণ!
দ্বিধান্বিত ভারত-মহিমা!
সভ্যতার ছদ্মবেশে হিংস্র আত্মার দুর্মতি, জিঘাংসা, নগ্ন চাতুরী,
বাণিজ্যের নির্লজ্জ বিড়ম্বনা—
কলঙ্ক দিয়েছে লেপে তার চতুঃসীমায়, বিধ্বস্ত জীবন!

তবুও মুগ্ধ স্মরণ প্রতি পল, অনুপল অবসন্ন করে,
বুকের আড়ালে নিঃসঙ্গ-ব্যর্থ-অশ্রু অবিশ্রান্ত ঝরে;
সময় ও ক্ষয় সে সুদিন করেছে হরণ।

ত্বাখ—আমার ভারতবর্ষ পড়ে আছে মৌন, অসহায়, নীরক্ত বেদনায়
বিষণ্ণ পৃথিবীর 'পরে!

## জয় গোস্বামী

### এসেছি কামদেব

খালি কেরোসিন টিন হাতে যে ছেলেটি ফিরে এলো বাড়ি
এসেছি কামদেব আমি তার কর্মা নিয়ে তব কাছে
বিড়ির দোকান দিলো যে ছোঁড়াটা ঘরে যার একপাল বোন
এসেছি কামদেব আমি তার কর্মা নিয়ে তব কাছে
সোনা, যে বানায় চা, ছ'টা থেকে রাত্তির এগারোটা অবধি
এসেছি কামদেব আমি তার কর্মা নিয়ে তব কাছে
সাইকেল-সারানো বিনু, সেজেনে একসাথে পড়তো, রাত্রিবেলা
মদ খেয়ে ফেরে
এসেছি কামদেব আমি···তার সেই ছোকরা, যেটা
কাঁধে লেমনেড নিয়ে একটিবার ঘুরে তাকিয়েছে
কোন্ দিকে তা বলব না। তাকিয়েছে এই মাত্র।
ওদের বাবার দিব্যি, ওদের মায়ের
এসেছি কামদেব, শালা, মুনভাত ব্যবস্থা করো
ওদের সবার জন্য মেয়ে দেখে দাও।

## দাউদ হায়দার

### আমরা সবাই নেতা

দর্পণে ও কার মুখ, তোমার আমার নাকি প্রত্যেকের
না-কি, মানব নামধারী কংসের ?

হয়তো বা তাই। হয়তো বা সবাই শাসকের
ভূমিকায় অবতীর্ণ ; ধরবে দণ্ড, রাজবংশের।

ভাখো, কী অবস্থা দেশের ; দশের ভাগ্যে আজ
মৃত্যু ছাড়া কিছু নেই। প্রতিবাদী কেউ নয়, অথচ সবাই
ভুলেছি স্বাধীনতা, যুদ্ধ ;—বিস্মৃত জাতির সাজ
সত্যিই পিপীলিকা-তুল্য ; বোঝাবে কে, তেমন বুদ্ধিজীবী
রাজনীতিবিদ কই ! 'শুধু চাই
সিংহাসন' ;—ব'লে আমি-তুমি প্রত্যেকে নেমেছি পথে,
কেউবা ভিখিরীর সাজে, কেউবা সৈনিক বস্ত্রে—
যে যেমন সাজে, সজ্জিত হতে দাও মারণ-অস্ত্রে।

—আমরা সবাই নেতা, আমাদের এই নেতার রাজত্বে।
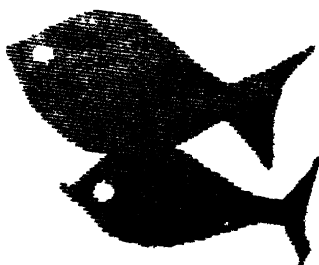
মৃদুল দাশগুপ্ত

## গোপন ভারতবর্ষ

উড়তে উড়তে নামলাম, শান্ত

এ কাদের দেশ

পাহাড় না হ্রদ, গাছ না পাথর

মরুভূমি, কাদের

ছায়ার পিঠে ছায়া, অলস কিন্তু উত্তেজিত

কায়া

তারা আমায় মারলো, ভীষণ মারলো

কাদের দেশ

দুঃস্বপ্নের মতো ছড়ানো পালক, হাড়

কিসের

নদীর ভেতর পাথর, আঠার মতো জল

কী অসহ্য

ক্ষতের ওপর লাগিয়ে দিই বালি, ডাকবো

কিন্তু কাকে

গভীর, ঘন, হারিয়ে যাচ্ছে চোখ, অন্ধকারে

দিকভ্রান্তি

ঘাড় ফেরাতে কষ্ট, দেখি ঢাল বেয়ে এগিয়ে আসছে

লণ্ঠন

লণ্ঠনের পর লণ্ঠন

# সংযোজন

# মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

## আমার ধ্যানের ভারত

আমার মনে হয়, ভারতের আদর্শ অন্যের মত নয়।
পৃথিবীতে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনা করার কাজে ভারতই উপযুক্ত!
স্বেচ্ছায় এই দেশ যে আত্মশুদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে,
দুনিয়াতে তার তুলনা নেই।
ঐশী শক্তির অস্ত্রে ভারত সংগ্রাম ক'রে এসেছে :
এবং এখনও ভারত তা করতে পারে।
অন্যান্য জাতিসমূহ পশুশক্তির উপাসক···
ভারত আত্মার শক্তিতে সব কিছু জয় করতে পারে।
আত্মার শক্তির কাছে পশুশক্তি যে তুচ্ছ
তার বহু প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।
কবি তার জয়গাথা গেয়েছেন
এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাগণ স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গেছেন।

ভারতকে আমি স্বাধীন এবং শক্তিশালী এইজন্য দেখতে চাই,
যেন জগতের উন্নতিকল্পে ভারত স্বেচ্ছায় পবিত্র মনে
নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে।
ভারতের স্বাধীনতার ফলে সংগ্রাম ও শান্তি সম্পর্কীয়
বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপ্লব এনে দিতে হবে।

ইউরোপের সভ্যতা নিঃসন্দেহে ইউরোপীয়দের উপযোগী।
তবে আমরা যদি তার অনুকরণ করতে যাই
তবে ভারতবর্ষের ধ্বংস অনিবার্য।
তবে এ কথার অর্থ এ নয় যে
তাদের মধ্যে যা কিছু ভাল
এবং যা আমাদের পক্ষে আত্মীকরণ সম্ভব,
তা আমরা গ্রহণ করব না।

এমন এক ভারত সৃষ্টি করার জন্য আমি কাজ করে যাব,
যেখানে দরিদ্রতমও অনুভব করবে যে এ তারই দেশ
এবং এর উন্নতির পথে তার মতামতও যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে :
এমন এক ভারত, যেখানে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ থাকবে না
এবং যেখানে সকল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করবে।
এই ভারতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বা সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের স্থান নেই।

নারী, পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে।
বিশ্বের অপরাপর অংশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে শান্তিপূর্ণ,
আর আমরা অপর কাউকে শোষণ করব না।
বা কারও দ্বারা শোষিত হব না ব'লে
আমাদের সৈন্যবাহিনী হবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র।
কোটি কোটি মূক জনসাধারণের হিতের পরিপন্থী না হলে,
ভারতীয় কিংবা অভারতীয় স্বার্থসমূহকে সততার সঙ্গে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে।
বিদেশী এবং ভারতীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাখা আমি ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করি।...
এই আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ...অন্য কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না।

[ অংশ বিশেষ ]

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

### ভারতশিল্পের ঐক্য ও বৈচিত্র্য

নতুন নতুন দেবতার রূপে, বাহনের রূপে, প্রতীকের ছলে, প্রতিমার বেশে
দেবলোক নেমে এলো মর্ত্তলোকের বুকের উপরে।
শিল্পীর রচা রূপের পরিখা ও দুর্গপ্রাচীর
তারি মধ্যে চিরকালের মতো দেবতাসমস্ত বরাভয়হস্তে স্থির হয়ে বসলেন,

শিল্পকৌশলের চমৎকারিতা পরিপূর্ণতা পেয়ে
তাবৎ শিল্পকে একটি অদ্বিতীয় স্থান দিতে চললো জগতে।

এই যুগটাকে ভারতশিল্পে অবতারযুগ বলে ধরতে পারি।
আর্য-অনার্য সবাই মিলে কালে কালে যে-সব কল্পনার সঞ্চয়
কাব্যে-সাহিত্যে-ধর্মগ্রন্থে জমা করে তুললে
মানুষ, সেইগুলোই রূপ পেয়ে অবতীর্ণ হতে থাকল
কলাকৌশলের রাস্তা ধরে।
যা গল্পে-কথায়, যা সুরে ও ছন্দে,
যা তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অগোচরভাবে বর্তমান হচ্ছিল চোখের সামনে,
তা রূপ ধরে দাঁড়াল চিত্রপটে প্রস্তরের ও ধাতুর মূর্তিতে
নাট্যে-নৃত্যে-যাত্রায়।

ইন্দ্রের বজ্র সে রূপ ধরে পূজার্হ হয়ে রইলো তিব্বতের শিল্পীদের হাতে,
ইন্দ্র রূপ পেলেন ইলোরা গুহার শিল্পীদের হাতে,
সূর্য রূপ পেলেন উড়িষ্যার কারিগরের হাতে,
বাংলা রূপ দিলে দেবীগণের,
দ্রাবিড় সভ্যতা রূপ দিলে প্রলয় তাণ্ডবের ছন্দকে রূপের বিরাট ঢেউ-এ ঢেউ-এ।

দুইভাবে মিলে রূপের রাগলীলা চলল।

আর্যাবর্তের অন্তর বাহির দুইগতি মস্ত একটা চক্র সৃষ্টি করলে
পৃথিবীর শিল্পীদের জগতে।

কত উষা, কত রাত্রি, কত শীত, কত শরৎ ও বসন্তে
ক্ষণে ক্ষণে আলোছায়া এবং মায়ার রঙ বুলিয়ে গেছে
এই যুগ যুগ ব্যাপী আমাদের শিল্পচেষ্টার উপরে—
পাথরে-চিত্রে-অলঙ্কারে-ভূষণে-কাপড়ে
মন্দিরে-দীনের কুটিরে-রাজার প্রাসাদে—
তার লক্ষণ সমস্ত সুস্পষ্ট বিদ্যমান দেখি আজও।

# অরবিন্দ ঘোষ

## হও ভারতবাসী

যদি তোমাদের মনকে ইউরোপীয় ভাবের দাস করিয়া রাখ,
যদি জীবনকে কেবল বাহিরের দৃষ্টি দিয়া দেখ—
বাহিরের হিসাবে তোমরা কিছুই নও,
কিন্তু অন্তরের অধ্যাত্মের হিসাবে তোমরা সবই।
এক ভারতবাসীই সব বিশ্বাস করিতে পারে,
সব দুঃসাহস করিতে পারে, সব বলি দিয়া দিতে পারে।
সুতরাং সকলের আগে হও ভারতবাসী।
তোমার পিতৃপুরুষের সম্পদ উদ্ধার করো।
উদ্ধার করো আর্যের চিন্তা, আর্যের সাধনা,
আর্যের স্বভাব, আর্যের জীবনধারা।
উদ্ধার কর বেদান্ত, গীতা, যোগ-দীক্ষা।
এ সকল শুধু মস্তিষ্ক দিয়া, ভাবাবেগ দিয়া ফিরিয়া পাইলে চলিবে না,
জাগ্রতজীবনে উহাদিগকে ফলাইয়া ধরিতে হইবে।
জীবনক্ষেত্রে ঐ সকল বস্তু মূর্তিমান করিয়া তোল,
তোমরা মহান, শক্তিমান, বীর, অজেয়, নির্ভীক হইয়া দাঁড়াইবে।
জীবন বা মৃত্যু তোমাদিগকে কোন শঙ্কাই আনিয়া দিবে না।
দুঃসাধ্য, অসম্ভব—এসব কথা তোমাদের ভাষায় আর স্থান পাইবে না।
অন্তরাত্মার যে শক্তি তাহাই অসীম অনন্ত—
বাহিরের সাম্রাজ্য যদি ফিরিয়া পাইতে চাও,
তবে আগে অন্তরের স্বরাজ ফিরিয়া পাও ;
মায়ের আসন এইখানে,
শক্তিসঞ্চার করিবেন বলিয়াই তিনি পূজার অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

# অরবিন্দ ঘোষ

## ভারতমাতা

আমাদের একতার প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের অভাব।
আমাদের রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে
অসমর্থ ছিলেন।
রণজিৎ সিংহ বা গুরুগোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়া পঞ্চনদমাতা
দেখিয়াছিলেন।
আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম—
সেই দর্শন অখণ্ড দর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি
অবশ্যম্ভাবী,
কিন্তু ভারতমাতার অখণ্ড মূর্তি এখনও প্রকাশ হয় নাই।
কংগ্রেসে যে ভারতমাতার পূজা নানারূপ স্তবস্তোত্রে করিতাম,
সে কল্পিত, ইংরাজের সহচরী ও প্রিয় দাসী, ম্লেচ্ছবেশভূষাসজ্জিতা
দানবী মায়া,
সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা
নিবিড় অস্পষ্ট আলোকে লুকাইত থাকিয়া আমাদের মন-প্রাণ
আকর্ষণ করিতেন।
যেদিন অখণ্ড স্বরূপ মাতৃমূর্তি দর্শন করিব,
তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্ত
উন্মত্ত হইব, সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে,
ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজসাধ্য হইবে।

# মহম্মদ ইকবাল

## তরানায়ে হিন্দী

সারে জহাঁসে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা
হম্ বুলবুলেঁ হ্যায় ইসকী এহ্ গুলসিতাঁ হমারা
গুর্বতমেঁ হো অগর হম রহ্‌তা হ্যায় দিল্ ওতন মেঁ
সমঝো ওহী হমেঁভী দিল হো জহাঁ হমারা
পর্বত ওহ্ সবসে উঁচা হমসায়া আস্‌মাঁকা
ওহ্ সন্তরী হমারা ওহ্ পাসবাঁ হমারা
গোদী মেঁ খেলতী হ্যায় ইসকী হজারোঁ নদীয়াঁ
গুলশন হ্যায় জিনকে দমসে রশ্‌কে জিনাঁ হমারা
অয়ে আবরুদে গঙ্গা ওহ্ দিন হ্যায় ইয়াদ তুঝকো
উতরা তেরে কিনারে জব কারোয়াঁ হমারা
মজহব নহী সিখাতা আপস মেঁ বয়ের রখনা
হিন্দী হ্যায় হম্ ওতন হ্যায় হিন্দোস্তাঁ হমারা
য়ুনানো মিসরো রোমা সব মিট গয়ে জহাঁসে
অব তক মগর হ্যায় বাকী নামো নিশাঁ হমারা
কুছ বাৎ হ্যায় কে হস্তী মিটতী নহী হমারী
সদিয়োঁ রহা হ্যায় দুশমন দৌরে জমাঁ হমারা
ইকবাল কোয়ী মহরম অপনা নহী জহাঁমেঁ
মালুম ক্যা কিসীকো দর্দে নিহাঁ হমারা

# মহম্মদ ইকবাল

## ভারত-সঙ্গীত

সারা দুনিয়ার সেরা দেশ এই মোদের হিন্দুস্থান,
মোরা বুলবুল তার, সে মোদের কুসুমের উদ্যান।
বিদেশ-বিভুঁয়ে থাকি যদি কভু
প্রাণ আমাদের দেশে রয় তবু,
যেথা প্রাণ জেনো আমরাও সেথা রহি গো বিদ্যমান।

আকাশের সাথী ঐ যে ভূধর
সবাকার চেয়ে উচ্চ শিখর,
সে-ই আমাদের সেনানী, মোদের রক্ষক সুমহান।

অগণন নদী কোলে করে খেলা
বারি সিঞ্চিত কুসুমের মেলা,
কিবা তার কাছে স্বরগের বন নন্দন অতুলান।

সেদিনের কথা পড়ে কিগো মনে
পুণ্য সলিলা গঙ্গা, যে ক্ষণে
আসি তোর নীরে প্রথম আমরা করেছি পুণ্যস্নান ?

মোদের ধরম কভু নাহি কয়
শত্রু করিতে ভ্রাতৃনিচয়,
হিন্দুস্থান জননী, আমরা সবে তার সন্তান।

আছিল মিশর, আছিল য়ুনান,
ছিল রোম, আজি কি আছে প্রমাণ ?
জগতের বুকে দেখো আজো মোরা রহিয়াছি গরীয়ান্।

শত শতাব্দী রহিয়া আঁধার
আজো কেন দীপ জ্বলে অনিবার ?
আজো কেন আছে জগতের বুকে আমাদের সন্ধান ?

ইকবাল কহে জগৎ মাঝার
বন্ধু মোদের কেহ নাহি আর,
কেবা জানে আর মোদের গোপন বেদনার সন্ধান ।

[ অনুবাদক : সত্যা গঙ্গোপাধ্যায় ]
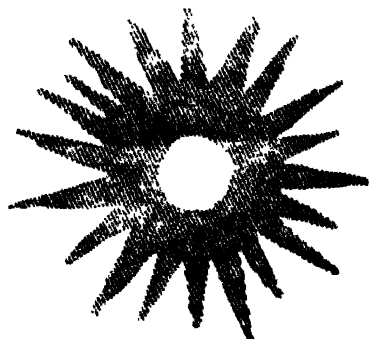
## জওহরলাল নেহেরু

### প্রাচীন সভ্যতা ও আমাদের উত্তরাধিকার

মিশর, নোসস, ইরাক, গ্রীস—সব চলে গেছে।
বাবিলন আর নিনেভে-র মতো তাদের অতীত সভ্যতাও আজ
অস্তিত্বহীন।
আর এই পুরোনো সভ্যতার দলের অন্য ছুটি প্রাচীন দেশ?
চীন আর ভারত?
অন্যান্য দেশের মতো সেখানেও
সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গড়েছে এবং ভেঙেছে।
আক্রমণ, ধ্বংস, লুঠতরাজ হয়েছে খুব বড়ো হারে।
শত শত বছর ধরে এক রাজার বংশ শাসন করেছে,
আবার অন্যে এসে তাদের জায়গা নিয়েছে।
অন্য সব জায়গার মতো চীন আর ভারতেও এ সব ঘটেছে।
কিন্তু চীন আর ভারত ছাড়া আর কোথাও
সভ্যতার একটা প্রকৃত অবিচ্ছিন্নতা দেখা যায় নি।
সমস্ত পরিবর্তন, যুদ্ধবিগ্রহ, আক্রমণ সত্ত্বেও
এই ছুটি দেশেই প্রাচীন সংস্কৃতির সূত্র একটানা চলেছে।
একথা ঠিক যে,
ছুটি দেশই তাদের অতীত গৌরব থেকে অনেক নেমে গেছে,
আর অতীতের সেই সংস্কৃতি
সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত ধুলোয় আবর্জনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে;
কিন্তু তবু তারা টিকে আছে,
আর ভারতের সেই প্রাচীন সভ্যতাই
আজকের ভারতীয় জীবনধারার ভিত্তিস্বরূপ।
আজকের পৃথিবীতে হাওয়া বদল হয়েছে।
বাষ্পজাহাজ, রেলপথ আর প্রকাণ্ড কারখানায়
পৃথিবীর চেহারায় পরিবর্তন ঘটেছে।

হয়তো, হয়তো কেন খুবই সম্ভবত,
ভারতবর্ষের চেহারাও বদলে যাবে,
বদলে যাচ্ছেও ক্রমশ।
কিন্তু ইতিহাসের উষা থেকে সোজা আমাদের যুগ পর্যন্ত
ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতির যে বিশাল পরিপ্রেক্ষিত ও অবিচ্ছিন্নতা
এর কথা ভাবতেও কৌতূহল জাগে, চমৎকৃত হতে হয়।
একদিক দিয়ে আমরা ভারতীয়েরা এই বহুসহস্র বছরের উত্তরাধিকারী।
একদা যাঁরা উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে
এই ব্রহ্মাবর্ত বা আর্যাবর্ত বা ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থানের
সূর্যহসিত সমভূমিতে এসেছিলেন, আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
পাহাড়ে পথ বেয়ে তাঁরা নীচের অজানা ভূমিতে দলে দলে নেমে
আসছেন,
দেখতে পাও না?
বীর তাঁরা, দুঃসাহসের তেজে পূর্ণ প্রাণ,
পরিণামের ভয় না করে এগিয়ে এসেছিলেন।
মৃত্যু এলে পরোয়া করতেন না তাঁরা,
হাসিমুখে বরণ করে নিতেন তাকে।
কিন্তু জীবনকে তাঁরা ভালোবাসতেন,
জানতেন যে জীবনকে ভোগ করা যায় একমাত্র নির্ভয় হলে,
পরাজয়-দুর্দৈব নিয়ে উদ্বিগ্ন হলে চলে না।
যারা ভয়হীন,
পরাজয়-দুর্দৈব তাদের থেকে কেন জানি তফাতে থাকে।
ভাবো তাঁদের কথা,
আমাদের সেই বহু দূরের পূর্বপুরুষ যাঁরা,
অভিযানের পথে সহসা তাঁরা
সাগরগামী পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে এসে উপনীত হলেন।

না জানি সে দৃশ্য তাঁদের কত উৎফুল্ল করে তুলেছিল।
নত হয়ে তাঁরা যে তাঁদের সুললিত ব্যঞ্জনাময় ভাষায়
তার প্রশস্তি গেয়েছিলেন
তাতে আর আশ্চর্য কী!

সত্যই বিস্ময় জাগে যে আমরাই
সেইসব যুগের উত্তরাধিকারী।
কিন্তু দম্ভ করা উচিত নয়,
কারণ সে যুগের ভালো মন্দ, দুয়েরই উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি।
আর আজকের ভারতে বহু মন্দ জিনিস রয়ে গেছে,
যা বিশ্বে আমাদের নীচু করে রেখেছে,
আমাদের মহান্ দেশকে নিদারুণ দরিদ্র করে ফেলেছে,
অন্যের হাতের পুতুল করে তুলেছে।
কিন্তু আমরা কি স্থির করে ফেলিনি যে এ আর চলবে না?

[ অংশ বিশেষ ]

## জওহরলাল নেহেরু

### 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'

চোখের সামনে যখন থাকো তখন তুমি প্রিয়দর্শিনী।
চোখের আড়ালে রয়েছ ব'লে তোমায় যেন
আরও বেশী ক'রে ভালো লাগে।

আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসে মনে হল
সুদূর মেঘ গর্জনের মতো
যেন বহু কণ্ঠের একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি।
প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারি নি,
শুধু মনে হ'ল শব্দটা যেন চেনা-চেনা,
যেন বুকের মধ্যে তার অনুরণন বাজছে।
জনতা নিকটতর হলে কথাগুলোও স্পষ্টতর হল,
আর বুঝতে বাকি রইল না।
'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সমস্ত কারাগার মুখর হয়ে উঠল।
মনটা খুশীতে ভরে উঠল।
আমাদের এত কাছাকাছি, কারা প্রাচীরের ঠিক অপর পাশেই
কারা যে বিপ্লবের বাণী ঘোষণা করে চলে গেল জানি না।
হয়তো তারা এই শহরেরই লোক,
হয়তো তারা গাঁ থেকে এসেছে—কৃষকের দল।
নাই-বা জানলাম ওরা কোথাকার লোক—
ওদের ওই নূতন যুগের আবাহনমন্ত্রে
আমাদের সমস্ত মন যেন নীরবে সাড়া দিল।

'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' এই বাণীর অর্থ কী ?
কেনই-বা আমরা বিপ্লব চাই ?
ভারত আজ অনেক কিছু নূতন ক'রে গড়তে চায়।
যে বিরাট পরিবর্তন আমরা আনতে চাই

তা যখন সার্থক হবে, যখন আমরা স্বরাজ পাব,
তখনও কিন্তু আমাদের চুপচাপ বসে থাকা চলবে না।
প্রাণবস্তু যা কিছু তার ক্রমাগত অদলবদল ঘটছে।
সমস্ত প্রকৃতি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে নিত্যনূতন হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।
একমাত্র প্রাণহীন জড়পদার্থ অচল হয়ে বসে থাকে।
উৎসধারা আপনার বেগে বেরিয়ে যেতে চায়,
তাতে যদি বাধা দাও তা হলে সে অপরিচ্ছন্ন ডোবায় পরিণত হবে,
আপনাকে নিরর্থক করে দেবে।
মানুষ কিংবা জাতির জীবনটাও এইরকম একটা অব্যাহত ধারা।
আমাদের ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্ আমরা বড়ো হবই।

বিপ্লবের দুয়ারে এসে আমরা আজ দাঁড়িয়ে আছি।
ভবিষ্যৎ কী বহন করে আনবে তা জানি না,
তবে বর্তমানেও আমাদের শ্রমের প্রভূত পুরস্কার তো আমরা পেয়েছি।
আজ দেশের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখো—
কী গর্বভরে তাঁরা এই আন্দোলনে
সবার আগে এগিয়ে চলেছেন।
শান্ত অথচ দুর্দম এই বীরাঙ্গনাদের অগ্রগতির সঙ্গে
তাল মিলিয়ে আজ সবাইকে চলতে হচ্ছে।
যে পর্দার অভিশাপের আড়ালে এঁরা আত্মগোপন করেছিলেন,
আজ সে পর্দা কোথায়?
অতীত যুগের বহু নিদর্শনের সঙ্গে
যাদুঘরে তা স্থান পেতে চলেছে।

কেবল মেয়েদের কেন, শিশুদেরও দেখো,
তাদের বানর-সেনা, বালসভা, বালিকাসভার দিকে তাকাও।
এইসব বালকবালিকার বাপ-পিতামহ কেউ কেউ
হয়তো অতীতকালে ভীরুর মতো ব্যবহার করেছে,
বিজাতীয়ের দাসত্ব করেছে।

এ যুগের ছেলেমেয়েরা ভীরুতা কিংবা গোলামি
কোনোটাই বরদাস্ত করবে না—
সে কথা বুঝতে আজ আর কারও বাকি নেই।

কালের চাকা ঘুরে চলেছে
যারা তলায় চাপা পড়ে ছিল
তারা আজ উপরে উঠে আসছে,
উপরওয়ালারা নেমে যাচ্ছে নীচে।
এ দেশের চাকা-ঘোরার সময় এসেছে এবার।
চাকার গায়ে কাঁধ লাগিয়ে এবার আমরা এমন ধাক্কা দেব যে,
সে চাকার ঘূর্ণি আর কেউ থামাতে পারবে না।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

[ অংশ বিশেষ ]                                        ৭ই জানুয়ারি, ১৯৫১

## জওহরলাল নেহেরু

### আজ সেইদিন এসেছে

আজ সেইদিন এসেছে—বিধিনির্দিষ্ট সেই দিন।
দীর্ঘদিনের সুপ্তি ও সংগ্রামের পর ভারত আবার উঠে দাঁড়িয়েছে—
জাগ্রত, তেজোদ্দীপ্ত, মুক্ত, স্বাধীন ভারত।
অতীত এখনো অপেক্ষমান।
এই ইতিহাস রচিত হবে।
আমাদের বহুবিঘোষিত শপথ পূর্ণ করতে এখনো অনেক কাজ বাকি·
সন্ধিক্ষণ অতীতে পর্যবসিত হল,
আমাদের জন্য নতুন ইতিহাস অপেক্ষমান।
এই ইতিহাস রচিত হবে আমাদের জীবন ও কর্মের সমাহারে।
ভাবীকালের ঐতিহাসিক তা লিপিবদ্ধ করবেন।

ভারত, সমগ্র এশিয়া ও বিশ্বের পক্ষে এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পুবের আকাশে নতুন একটি নক্ষত্রের উদয় হল—স্বাধীনতার সূর্য।
একটি নক্ষত্র কখনো যেন অস্ত না যায়,
এই আশা কোন চক্রান্তে যেন ব্যর্থ না হয়।

যদিও মেঘ আমাদের চারিদিকে,
দেশবাসীর অনেকেই আজ বেদনাহত,
কঠিন সমস্যায় আমরা ঘেরাও,···
তবু এই স্বাধীনতা নিয়ে আসে দায়িত্ববোধ, দায়ভার।
স্বাধীন, সুশৃঙ্খল জাতির মত আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে।

আজ সর্বাগ্রে আমাদের চিন্তা ধাবিত হচ্ছে তাঁর প্রতি,
যিনি এই স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির জনক।
ভারতের প্রাচীন আত্মাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে
যিনি স্বাধীনতার মশাল তুলে আমাদের চারিদিকের তমসাকে
উদ্ভাসিত করেছিলেন।
কখনো-কখনো আমরা তাঁর যোগ্য অনুগামী হতে পারিনি,
বহুবার তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করেছি ;

কিন্তু আত্মবিশ্বাসে, আত্মিক শক্তিতে,
সাহসে ও বিনয়ে গরিমাময় এই প্রবলপ্রাণ
ভারত-সন্তানের আত্মিক প্রভাব ও বাণী শুধু আমাদেরই নয়,
পরবর্তী পুরুষদের হৃদয়েও জেগে থাকবে।
যতই গর্জে আসুক ঝড়ের রাত্রি, স্বাধীনতার এই মশালকে
আমরা নিভে যেতে দিব না।

এরপরই স্মরণ করি স্বাধীনতা সংগ্রামের
অজ্ঞাত সেবক ও সৈনিকদের।
প্রশংসা বা পুরস্কারের প্রত্যাশা না করেই
তাঁরা ভারতের সেবা করেছেন,
মৃত্যুকেও বরণ করেছেন।

স্মরণ করি, আমাদের সেই সব ভাইবোনকে,
যাঁরা রাজনীতিক সীমানার ওধারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
এই স্বাধীনতা-উৎসবে অংশ নিতে পারলেন না।
তাঁরা আমাদের আপনজন, ভবিষ্যতে তাই-ই থাকবেন।
যাই ঘটুক না কেন, তাঁদের সুখ দুঃখ সমানভাবে
আমরা ভাগ করে নেব।

ভবিষ্যৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
কোন্ পথে আমরা যাব, কী হবে আমাদের কাজ?
আমরা ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে
মুক্ত ক'রে তার সামনে সুযোগ এনে দেব।
দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে
তাকে নির্মূল করব।
সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন করব।
রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করব,
যাতে ন্যায় এবং নরনারীর পূর্ণ প্রাণের দাবি রক্ষিত হয়।

[ স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে জওহরলাল নেহরুর জাতির উদ্দেশে ভাষণের অংশ ]

# সুভাষচন্দ্র বসু

## ভারতের জাতীয় সংহতি

ভৌগোলিক দিক হইতে, ভারতকে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে
বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অংশ বলিয়া বোধ হয়।
উত্তরে যাহার সীমানা নির্দেশ করিতেছে সুবিশাল হিমালয় পর্বত,
অসীম সমুদ্র যাহার দুই দিক বেষ্টন করিয়া আছে—
সেই ভারত ভৌগোলিক সত্তার একটা সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।
ভারতে বিভিন্ন জাতি লইয়া কখনও কোনও সমস্যা দেখা দেয় নাই—
কেননা তাহার সমগ্র ইতিহাসে বিভিন্ন জাতিকে একাত্ম করিয়া লইতে
এবং তাহাদের মধ্যে একটা সাধারণ কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সঞ্চারিত করিতে
সে সমর্থ হইয়াছে।

এই বন্ধনের সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ হিন্দুধর্ম।
উত্তর কিংবা দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম যেখানেই আপনি যান না কেন,
এক ধর্মমত, এক সংস্কৃতি এবং একই ঐতিহ্য দেখিতে পাইবেন।
সকল হিন্দুই ভারতবর্ষকে পবিত্রভূমি বলিয়া মনে করে।
তীর্থগুলির মতই সারা দেশে ছড়াইয়া আছে বহু পবিত্র স্রোতস্বিনী।

যদি আপনাকে একজন ধর্মিক হিন্দু হিসাবে আপনার তীর্থযাত্রা
সম্পূর্ণ করিতে হয়,
তাহা হইলে আপনাকে একেবারে দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর হইতে
উত্তরে তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের বুকে অবস্থিত বদ্রীনাথ পর্যন্ত ভ্রমণ
করিতে হইবে।
শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ, যাঁহারা দেশকে তাঁহাদের বিশ্বাসে দীক্ষিত করিতে
চাহিতেন,
তাঁহাদিগকে সর্বদাই সমগ্র ভারত পর্যটন করিতে হইত।
আর তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠদিগের অন্যতম শঙ্করাচার্য
খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারিটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন,
যেগুলি অদ্যাবধি বিরাজ করিতেছে।
সর্বত্র একই শাস্ত্র পঠিত ও অনুসৃত হয়,
আর যেখানেই আপনি ভ্রমণ করুন না কেন,
রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য সর্বত্র সমান জনপ্রিয়।
মুসলমানদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ একটা নূতন সমন্বয়
গড়িয়া উঠে।

যদিও তাহারা হিন্দুদিগের ধর্ম গ্রহণ করে নাই, তবু তাহারা
ভারতবর্ষকে তাহাদের দেশ করিয়া লইয়াছিল
এবং জনগণের সাধারণ সামাজিক জীবন ও তাহাদের
সুখদুঃখের অংশীদার হইয়া উঠিয়াছিল।
পারস্পরিক সহযোগিতায় একটা নূতন শিল্প ও সংস্কৃতির উদ্ভব হইল,
প্রাচীন কাল হইতে যাহা ভিন্ন—অথচ যাহা স্পষ্টতই ভারতীয়।
স্থাপত্য, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে নূতন নূতন সৃষ্টি সম্ভব হইল—
যাহা সংস্কৃতির এই দুইটি ধারার মধুর মিলনের প্রতীক হইয়া উঠিল।

## সুভাষচন্দ্র বসু

### ভারতে নবজাগরণ

রামকৃষ্ণ সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন
এবং এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের বিরোধ দূর করিতে বলিয়াছেন।
…সমাজের অতি আধুনিক অনুকরণ-স্পৃহাকে নিন্দা করিয়াছেন।
মৃত্যুর পূর্বে, তিনি শিষ্যকে ভারতে ও ভারতের বাহিরে
তাঁহার ধর্মোপদেশগুলির প্রচারকার্যের ভার
এবং স্বদেশবাসীদিগকে জাগাইয়া তুলিবার দায়িত্ব দিয়া যান।
ঐ উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন
প্রতিষ্ঠা করেন—

যাহার লক্ষ্য ছিল ভারত ও ভারতের বাহিরে,
বিশেষতঃ আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রকৃত রূপটি প্রচার করা ও তদনুযায়ী
চলা ;

উপরন্তু সুস্থ জাতীয় কার্যকলাপের প্রতিটি উদ্যোগকে
প্রেরণা দানে তিনি একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।
তাঁহাদের নিকট ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণার উৎস।
তিনি নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের অতীতে গর্ববোধ,
তাহার ভবিষ্যতে বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় ও
আত্মমর্যাদার চেতনা সঞ্চারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।
যদিও স্বামীজি কখনও কোনও রাজনৈতিক বাণী প্রচার করেন নাই,
তথাপি যে কেহ তাঁহার বা তাঁহার রচনাবলীর সংস্পর্শে আসিয়াছে,
তাহার মধ্যেই একটা দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক মনোভাব গড়িয়া
উঠিয়াছে ;

অন্ততঃ বাংলাদেশ সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়,
স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের
আধ্যাত্মিক স্রষ্টা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

# ইন্দিরা গান্ধী

## আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু

আমি গর্বিত হব, যদি এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু ঘটে—
আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশের সেবায় লাগবে।
আমি নিশ্চিত যে আমার প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত
দেশের ধান-গম-জোয়ারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে
আনবে সবুজ শোভার স্বর্ণহাসি,
কলে-কারখানায় যন্ত্রে যন্ত্রে সঞ্চার করবে দ্রুত গতিশক্তি;
দেশ হয়ে উঠবে সমৃদ্ধিতে ভরা।

# উৎস-সংকেত

"টু ইণ্ডিয়া—মাই নেটিভ ল্যাণ্ড" কবিতাটি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তাঁর "দি ফকীর অব জঙ্গীরা" কাব্যের মুখবন্ধ হিসেবে লেখেন। প্রকাশকাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ। কলকাতা হিন্দু কলেজের শিক্ষক ও 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা কবি-ডিরোজিও ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবলভাবে মুক্তমনের অধিকারী। ইংরেজি ভাষায় তিনিই এদেশে প্রথম উক্ত দেশাত্মবোধক কবিতা লেখেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বদেশ আমার' নামে ডিরোজিও-র উক্ত কবিতার বাংলা-অনুবাদ করেন। ঐ অনুবাদটি রাজনারায়ণ বসুর "একাল ও সেকাল" গ্রন্থে সংকলিত আছে। 'ভারত আমার, স্বদেশ আমার' শিরোনামে ডিরোজিও-র উক্ত কবিতার একালীন অনুবাদ করেছেন গবেষক-লেখক ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত। এ প্রসঙ্গে তাঁর "ঝড়ের পাখি : কবি ডিরোজিও" গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'স্বদেশ' এবং 'ভারতের অবস্থা' কবিতা দুটির জন্য তাঁর রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

মধুসূদন দত্তের 'ভারত-ভূমি' কবিতাটি তাঁর "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"-র (১৮৬৬) ৯০ নং সনেট।

'শুন গো ভারতভূমি' কবিতা মধুসূদনের "শর্মিষ্ঠা" নাটকের প্রস্তাবনা অংশ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হায় কোথা সেই দিন' কবিতাংশ কবির "কর্মদেবী" ( ১৮৬২ ) গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

তাঁর 'স্বাধীনতা' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাংশ "পদ্মিনী-উপাখ্যান" থেকে গৃহীত। এ গান ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাণা ভীমসিংহের উৎসাহ বাণী।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর "নিসর্গ সন্দর্শন" থেকে 'সমুদ্র-দর্শন' কবিতাংশ গৃহীত।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "মহিলা" কাব্য (১৮৮০) থেকে 'মাতৃ-স্তুতি' নেওয়া হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "আনন্দমঠ" উপন্যাসের প্রথমখণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ থেকে 'বন্দে মাতরম্' কবিতা উৎকলিত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কবিতাবলী" ( ১৮৮০ ) থেকে 'ভারত-সঙ্গীত' গৃহীত। 'রাখি-বন্ধন' কবিতাটি কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন উপলক্ষে লেখা (১৮৮৬)।

গোবিন্দচন্দ্র রায়ের "গীতি কবিতা" (১৮৮২) থেকে 'ভারত-বিলাপ' গৃহীত।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারত-সঙ্গীত' ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে গাওয়া হয়। এ গানটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক।... বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

নবীনচন্দ্র সেনের "রৈবতক" কাব্য থেকে 'ভারতের তপোবন' অংশটি নেওয়া।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বীণাবাদিনী" ( ১৮৯৮ ) থেকে 'চল্ রে চল্ সবে' নেওয়া। 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' স্বদেশী যুগে বিখ্যাত গান।

রাজকৃষ্ণ রায়ের "ভারতগান" থেকে 'ভারতজননী' নেওয়া।

ভাওয়ালের স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'স্বদেশ' কবিতা বিখ্যাত। নব্যভারত, পৌষ, ১৩১৭-এ প্রকাশিত। 'আমরা হরিহর' কবিতাটি "বৈজয়ন্তী" কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার [ অধ্যয়ন প্রকাশন ] ( শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষের ভূমিকা সংবলিত ) থেকে অশ্বিনীকুমার দত্তের কবিতা-গান গৃহীত।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর "স্বদেশিনী" ( ১৯০৬ ) থেকে 'আদেশবাণী' নেওয়া।

মোহম্মদ কাজেম আলকুরেশী 'কায়কোবাদ' নামে পরিচিত। তাঁর "অমিয় ধারা" কাব্য থেকে 'দেশের বাণী' গৃহীত।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের "স্বদেশী-সঙ্গীত" থেকে 'স্বদেশ-সঙ্গীত' গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতবিধাতা' কবিতা "গীতবিতান" থেকে, 'ভারততীর্থ' "গীতাঞ্জলি" কাব্য থেকে, 'ভারতলক্ষ্মী' "কল্পনা" কাব্য থেকে ( গীতবিতান/স্বদেশ পর্যায় ২৭নং গান দ্রষ্টব্য ) এবং "গীতবিতান" [ পূজা/স্বদেশ ] স্বদেশ-পর্যায় থেকে ১৬নং গান [ দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী ], ১৭নং গান [ মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে ], ২৪নং গান [ সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে ], ২৫নং গান [ যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা। ], ৩৫নং গান [ এ ভারতে রেখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ— ], ৩৮নং গান [ আজি এ ভারত লজ্জিত হে গৃহীত। ]

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "যজ্ঞভস্ম" ( ১৯০৪ ) থেকে 'উদ্বোধন' কবিতাটি নেওয়া।

স্বামী বিবেকানন্দের "বর্তমান ভারত" থেকে 'স্বদেশমন্ত্র' এবং 'নূতন ভারত বেরুক' "পরিব্রাজক" গ্রন্থের অংশবিশেষ।

'ইহাই ভারতবর্ষ…' 'যদি ভারতবর্ষ…' 'পাগল হয়েছ কি…' শঙ্করীপ্রসাদ বসুর "বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন" গ্রন্থ [ আনন্দ পাবলিশার্স ] থেকে নেওয়া।

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের "আমার ভারত অমর ভারত" গ্রন্থের [ প্রকাশক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ] 'জাতীয়সংহতি' অধ্যায় থেকে 'হে পঞ্চনদের সন্তানগণ · ' (১০৩ পাতা), 'জ্বালাময়ী বাণী' অধ্যায় থেকে 'দেশদ্রোহী' ( ১৩৯ পাতা ) এবং 'যথার্থ ভালবাসা কখনও বিফল হয় না' ( ১৪৫ পাতা ) 'পুনরুত্থানের উপায়' অধ্যায় থেকে 'হে ভারতের শ্রমজীবী' ( ১৭ পাতা ) এবং 'আমার ভারত অমর ভারত' অধ্যায় থেকে 'আমি তোমাদের কাছে' ( ৭-৮ পাতা ) গৃহীত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'জন্মভূমি', 'স্বদেশ-স্তোত্র', 'করো না, করো না তার অপমান' "আর্যগাথা ( ১ম খণ্ড )" থেকে গৃহীত। 'ভারতবর্ষ' "সিংহল বিজয়" নাটকের চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য থেকে উদ্ধৃত। বিজয়ের সঙ্গিগণের গীত। 'সকল দেশের সেরা' "সাজাহান" নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য থেকে নেওয়া। সেখানে স্থান—যোধপুরের প্রাসাদকক্ষ। কাল · মধ্যাহ্ন। যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ। বালকদিগের প্রবেশ ও গীত।

চিত্তরঞ্জন দাশের "সাগর সঙ্গীত" কাব্যগ্রন্থের ৩৩ নং কবিতা—'পূজার সঙ্গীতে তব'।

সরলা দেবী চৌধুরাণীর "শতগান" ( ১৯০০ ) থেকে 'ভারত-জননী' কবিতা গৃহীত। 'নমো হিন্দুস্থান' কবিতাটি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে গীত।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শতনরী" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'মঙ্গল গীতি' নেওয়া।

ডঃ জয়গুরু গোস্বামী সম্পাদিত "চারণকবি মুকুন্দ দাস" গ্রন্থের ২০১ পাতার ( ২নং গান ) এবং ২৫৭ পাতার ( ৬০নং গান ) গান—যথাক্রমে 'ভারতের ভাগ্যপ্রাণগুলি', 'এসেছে ভারতে নব জাগরণ'।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "বেণু ও বীণা" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'সন্ধিক্ষণ' নেওয়া।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "শ্রেষ্ঠকবিতা" থেকে 'ভারত-মহিমা' ও 'আমাদের ভারত' কবিতা দুটি নেওয়া হয়েছে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "মরুশিখা" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'দেশোদ্ধার' কবিতাটি নেওয়া।

'অতীতের ছবি' সুকুমার-রচনাবলী থেকে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'মাঘোৎসব' সপ্তাহের—অন্যতম অনুষ্ঠান বালক-বালিকা সম্মেলন উপলক্ষে পুস্তিকাটি প্রকাশিত ও বিতরিত হয়েছিল।

কাজী নজরুল ইসলামের "বিষের বাঁশী" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'শিকল-পরার গান' এবং "সর্বহারা" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গৃহীত।

'হিন্দুমুসলমান' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের "ঝরা পালক" কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'স্বাদেশিক' কবিতা "নতুন কবিতা" কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং 'ফেরারী ফৌজ' কবিতা "ফেরারী ফৌজ" কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'খুকু ও খোকা' ছড়াটি "রাঙা ধানের খৈ" সংকলন থেকে গৃহীত।

বিষ্ণু দে-র "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' এবং "আলেখ্য" কাব্যগ্রন্থ থেকে '৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪৮' কবিতাটি নেওয়া।

দিনেশ দাসের "ভুখ মিছিল" কাব্যগ্রন্থ ( ১৯৪৪ ) 'ভারত ছাড়ো : ১৯৪২' এবং 'বেতার : ১৯৪৩' কবিতা দুটি গৃহীত। দিনেশ দাসের কাব্যসমগ্রর 'পুরাতনী' পর্যায়ে 'অস্তি-চিমুর' এবং 'সাতারা-বিহার-মেদিনীপুর' কবিতা দুটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মধ্যপ্রদেশের অস্তি ও চিমুর অঞ্চল এবং সাতারা, বিহার, মেদিনীপুরে ব্রিটিশের অকথ্য অত্যাচারের পটভূমিকায় লেখা। 'ভারতবর্ষ' এবং 'পনেরই আগস্ট : ১৯৪৭' কবিতা দুটি "দিনেশ দাসের কবিতা" ( ১৯৫১ ) কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

মণীন্দ্র রায়ের "এক চক্ষু" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'স্বদেশ' কবিতাটি নেওয়া।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জননী জন্মভূমি' কবিতাটি "কাল মধুমাস" কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "অথচ ভারতবর্ষ তাদের" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'স্বদেশ আমার', 'অথচ ভারতবর্ষ তাদের' এবং 'মানুষ কেন বেঁচে থাকে' কবিতা সংকলিত। অন্য কবিতাগুলি তাঁর অন্যান্য লেখা থেকে সংগৃহীত।

জগন্নাথ চক্রবর্তীর "পার্কস্ট্রিটের স্ট্যাচু ও অন্যান্য কবিতা" (১৯৬৯) থেকে 'পার্কস্ট্রিটের স্ট্যাচু' কবিতাটি নেওয়া।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের "মিঠেকড়া" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' এবং "ঘুম নেই" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'মহাত্মাজির প্রতি' কবিতা নেওয়া হয়েছে।

শারদীয় 'ভারতকথা' ( ১৯৮৬ ) থেকে কৃষ্ণধরের 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' কবিতাটি গৃহীত।

শঙ্খ ঘোষের "দিনগুলি রাতগুলি" (১৯৫৬) কাব্যগ্রন্থ থেকে 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে' কবিতাটি নেওয়া।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের "ঝরছে কথা আতস কাচে" কাব্যগ্রন্থ (১৯৮৫) থেকে 'ভারতবর্ষকে নিয়ে' শিরোনামের মধ্যে পাঁচটি কবিতা (১. শিবালিক গিরিমালা, ২. লছমনঝুলায়, ৩. হরিদ্বারের পথে, ৪. জুবিন মেহ্‌তা, ৫. অমৃতসর।)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের "প্রচ্ছন্ন স্বদেশ" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' কবিতাটি নেওয়া। 'একটি দীর্ঘ গাছ' কবিতাটি ভারতমৈত্রী ইন্দিরা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পরই আনন্দবাজার পত্রিকায় বিশেষভাবে লিখিত। "ঈশ্বর থাকেন জলে কাব্যগ্রন্থ" থেকে 'স্বাধীনতার জন্যে' কবিতাটি নেওয়া।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ কবিতা 'ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর দাঁড়িয়ে' "সুন্দর রহস্যময়" কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। 'আমরা এ কোন্ ভারতবর্ষে' কবিতাটি শান্তনু দাসের "গঙ্গোত্রী" পত্রিকা থেকে সংকলিত।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের "ছায়ার সঙ্গে পা মিলিয়ে" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'দেশ আমার গৌরী' কবিতাটি নেওয়া।

অমিতাভ দাশগুপ্তের "আমি তোমাদেরই লোক" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'আমার নাম ভারতবর্ষ' এবং "মৃত্যুর অধিক খেলা" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'স্বদেশ' কবিতা গৃহীত।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের "ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'ভারতবর্ষ, তুমি বড় প্রিয় নাম' কবিতাটি নেওয়া।

তারাপদ রায়ের "নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'ক্রমাগত স্বাধীনতা চাই' কবিতাটি নেওয়া।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের "হাওয়া, স্পর্শ করো" কাব্যগ্রন্থ থেকে "প্রিয় মাটি' এবং 'বিদ্যুচ্চমকে দেখা যায়" কবিতা দুটি নেওয়া।

আশিস সান্যালের "এখন তথাগত" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'এ ভারত' কবিতাটি নেওয়া।

দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা থেকে 'ভারতবর্ষ' গৃহীত।

পার্থসারথি চৌধুরীর "মৃতবৎসা সসাগরা" (১৩০৯) কাব্যগ্রন্থ থেকে 'ভারতবর্ষ' কবিতাটি নেওয়া।

দেবী রায়ের "এই সেই তোমার দেশ" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'এই সেই তোমার দেশ' শিরোনামযুক্ত কবিতা।

ঈশ্বর ত্রিপাঠীর "একজন গ্রাম্য কবি" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'স্বাধীনতা' নেওয়া।

শান্তনু দাসের "মধ্যাহ্নের ব্যাধ" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'জন্মভূমি' কবিতাটি নেওয়া।

শান্তি সিংহের "লালমাটি নীল অরণ্য" (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থ থেকে 'ভারত' কবিতা, এবং "মাটিতে পা রেখে" কাব্যগ্রন্থ (১৯৮২) থেকে 'স্বদেশ আমার' কবিতা নেওয়া। 'জাতীয় সংহতি' কবিতাটি শারদীয় 'দক্ষিণীবার্তা' (১৯৮৬) পত্রিকায় প্রকাশিত।

সুব্রত রুদ্রের "যমপুরীতে কবিতা" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'উত্তরাধিকার' কবিতাটি নেওয়া।

অঞ্জন সেনের "পাঠ/ভারতবর্ষ" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'ভারতবর্ষ' কবিতাটি নেওয়া।

মৃদুল দাশগুপ্তের "জলপাইকাঠের এসরাজ" কাব্যগ্রন্থ থেকে 'গোপন ভারতবর্ষ' কবিতাটি গৃহীত।

## সংযোজন

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকা সমন্বিত—শ্রীর, কু, প্রভু সংকলিত "আমার ধ্যানের ভারত"—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ( মহাত্মা গান্ধীর লেখা ও বক্তৃতার একত্ররূপ )—গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন। 'আমার ধ্যানের ভারত' অধ্যায়ের অংশবিশেষ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী"-র 'আর্যশিল্পের ক্রম' রচনার অংশবিশেষ 'ভারতশিল্পের ঐক্য ও বৈচিত্র্য'।

ঋষি অরবিন্দের বক্তৃতা ও রচনার প্রাসঙ্গিক বাংলা অনুবাদ করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর "ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থে। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন। ঐ গ্রন্থের ১১৬-১১৭ পাতার অংশবিশেষ 'হও ভারতবাসী' এবং 'ভারতমাতা'।

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়ের "ইকবালের কবিতা" গ্রন্থ থেকে মহম্মদ ইকবালের 'তরানায়ে হিন্দী' এবং তার বাংলা অনুবাদ 'ভারত-সঙ্গীত' গৃহীত।

জওহরলাল নেহরুর-র "গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ( প্রকাশক: অশোককুমার সরকার, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—৯ ) দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৮। ঐ গ্রন্থের 'প্রাচীন সভ্যতা ও আমাদের উত্তরাধিকার' পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ—'প্রাচীন সভ্যতা ও আমাদের উত্তরাধিকার'। ঐ গ্রন্থের 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' পরিচ্ছেদের পরিচ্ছেদে সংক্ষেপিত অংশ—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

'আজ সেইদিন এসেছে'—স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল নেহরুর জাতির উদ্দেশে ভাষণের অংশ। পলাশ মিত্রের "নিরুপম নেহরু" গ্রন্থের ১৩৮-১৩৯ পাতা দ্রষ্টব্য।

সুভাষচন্দ্র বসুর "ভারতের মুক্তি সংগ্রাম" ( ১৯২০—১৯৪২ ) প্রথম খণ্ডের 'ভারতে রাষ্ট্রশাসনের পটভূমি' অধ্যায়ের অংশবিশেষ 'ভারতের জাতীয় সংহতি'। ঐ গ্রন্থের 'ভারতে নব জাগরণ' অধ্যায়ের অংশবিশেষ 'ভারতে নবজাগরণ'।

[illegible] আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার আগের দিন—১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, ইন্দিরা গান্ধী ভুবনেশ্বরের বিশাল ময়দানে যে ভাষণ দেন, সেই ব্যাঞ্জনাধর্মী ভাষণের অংশবিশেষ—'আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু'।

---